পঞ্চভূত

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

দুই টাকা আট আনা

দ্বিতীয় সংস্করণ .

আশ্বিন—১৩৬০

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য বই

কালের মন্দির	৩॥০
কালকূট	২॥০
কাঁচামিঠে	২॥০
ছায়াপথিক	৩৲
শাদা পৃথিবী	৩৲
বিষকন্যা	২॥০
ঝিন্দের বন্দী	৩৲
দুর্গরহস্য	৩॥০
কানামাছি	২॥০
ব্যোমকেশের ডায়েরী	২॥০
ব্যোমকেশের কাহিনী	২॥০
ব্যোমকেশের গল্প	২৲
যুগে যুগে	২॥০
পথ বেঁধে দিল	২॥০
বন্ধু (নাটক)	১৸০

পঞ্চভূত

মৃত্যুঞ্জয় ও শাশ্বতী—প্রেত দম্পতী। নিত্যানন্দ—অনেক প্রেতলোক, শুভ্রাংশু—নবাগত প্রেত। অমরনাথ—মানুষ। স্থান—একটি পোড়ো বাড়ির এক কক্ষ। কাল—পূর্ণিমার সন্ধ্যা।

কক্ষটি প্রেতলোকের নীলাভ প্রভায় আলোকিত। আলোক তীব্র নয়, অথচ সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যায়। কেবল মেঝে হইতে এক হাত উঁচু পর্যন্ত অন্ধকার; তাই ঘরের আসবাবগুলি মনে হয় যেন অর্ধনিমজ্জিতভাবে মাথা জাগাইয়া আছে।

পিছনের দেয়ালের মাঝখানে একটি বড় জানালা। কবজা ভাঙিয়া যাওয়ার ফলে জানালার কবাট হেলিয়া খুলিয়া আছে; বাহিরে আবছায়া গাছপালার ভিতর দিয়া চন্দ্রোদয় হইতেছে। ভিতরে, জানালার দুই পাশে, খানিকটা সম্মুখ দিকে, দুইটি পুরানো ধরণের কৌচ। ঘরের ডানদিকের দেয়ালে একটি দরজা, কালো পর্দা দিয়া ঢাকা। বাঁদিকের দেয়ালের গায়ে সেকেলে গঠনের একটি মেহগনি রঙের ড্রেসিং টেবিল। ঘরের প্রায় মাঝখানে সম্মুখের দিকে একটি ছোট গোলটেবিল ও দুটি চেয়ার রহিয়াছে। সব আসবাবের উপরেই ধূলার প্রলেপ; মনে হয়, দীর্ঘকাল এ ঘরে মানুষ পদার্পণ করে নাই।

ডান দিকের কৌচে শুইয়া শাশ্বতী ঘুমাইতেছে। শুইয়া আছে বলিয়া তাহাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। তাহার চেহারা মর্তলোকের কুড়ি বছর বয়সের মেয়ের মত; পরনে নীলাভ শাড়ী। সে পাশ ফিরিয়া হাঁটু গুটাইয়া গালের তলায় করতল রাখিয়া ঘুমাইতেছে।

জানালার বাহিরে একটা পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল—পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা—

সে থামিতেই একটা পেঁচা ডাকিল—ঘুৎ—ঘুৎ—ঘুৎ!

শাশ্বতী ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল; এখন তাহার কোমর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেল। সে হাই তুলিয়া আড়ামোড়া ভাঙিয়া পিছনে জানালার ধারে তাকাইল।

শাশ্বতী: ওমা! কত বেলা হয়ে গেছে—চাঁদ উঠেছে! কী যে আমার ঘুম, কিছুতেই সকাল সকাল ভাঙে না। (অন্য কোচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) উনি কখন উঠে গেছেন। কি দুষ্টু! আমাকে না জাগিয়ে দিয়েই বেরিয়ে যাওয়া হয়েছে—

শাশ্বতী উঠিয়া অলসপদে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; স্ত্রীস্বভাববশত নিজের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া, আঁচলে নাকের পাশ মুছিয়া খোঁপা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

শাশ্বতী: না, উনি এখুনি আবার ফিরে আসবেন। আজ দু'জনে মিলে বেড়াতে যাব। কোথায় যাব! চাঁদে বেড়াতে যাব? হ্যাঁ সেই বেশ হবে; অনেকদিন যাইনি—(সানন্দে গাহিয়া উঠিল)

আজ পূর্ণিমারই রাত রে
পাখির কূজনে আমরা দুজনে
চাঁদের ঘাটে উঠব গিয়ে জ্যোৎস্না-সাগর সাঁৎরে—।

এই পর্যন্ত গাহিয়া বাকি গানটুকু গুন্ গুন্ করিয়া গুঞ্জন করিতে করিতে শাশ্বতী চুলের বিনুনী খুলিয়া আবার বাঁধিতে লাগিল। চাঁদ ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে।

কালো পর্দা-ঢাকা দরজা দিয়া মৃত্যুঞ্জয় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার বয়স আন্দাজ ত্রিশ; গায়ে ধূসর

রঙের পাঞ্জাবী। মুখ অত্যন্ত শুষ্ক ও বিষণ্ণ, যেন এইমাত্র কোনও গুরুতর দুঃসংবাদ শুনিয়াছে, কিন্তু শাশ্বতীকে তাহা বলিতে ভয় পাইতেছে। সে এক-পা এক-পা করিয়া শাশ্বতীর দিকে অগ্রসর হইল।

আয়নায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া শাশ্বতী সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল; খোঁপা জড়াইতে জড়াইতে বলিল—

শাশ্বতী : এই যে—ফিরে আসা হয়েছে। একলাটি কোথায় পালানো হয়েছিল?—আজ কিন্তু চাঁদে বেড়াতে যেতে হবে, তা বলে দিচ্ছি—

মৃত্যুঞ্জয় শাশ্বতীর পিছনে দাঁড়াইয়া একবার অধর লেহন করিল, তারপর ভগ্নস্বরে বলিল—

মৃত্যুঞ্জয় : শাশ্বতী!

চমকাইয়া শাশ্বতী ফিরিয়া দাঁড়াইল। মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ দেখিয়া তাহার মুখেও উৎকণ্ঠার চকিত ছায়া পড়িল; সে মৃত্যুঞ্জয়ের একেবারে কাছে সরিয়া আসিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—

শাশ্বতী : কী, কী হয়েছে গা?

মৃত্যুঞ্জয় শাশ্বতীর দুই কাঁধে হাত রাখিয়া একটু ম্লান হাসিল।

মৃত্যুঞ্জয় : আর কি! ডাক এসেছে।

শাশ্বতী : ডাক এসেছে!

মর্মান্তিক সংবাদে শাশ্বতীর মুখখানা যেন শীর্ণ হইয়া গেল। সে বিহ্বলভাবে কিছুক্ষণ মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মৃত্যুঞ্জয় : (বিষণ্ণকণ্ঠে) হ্যাঁ, ডাক এসেছে—যেতে হবে। আবার সেই মানুষ জন্ম—সেই ক্ষিদে-তেষ্টা, রোগ-যন্ত্রণা, টাকার জন্যে মারামারি কাড়াকাড়ি, অন্নের জন্যে হাহাকার—

শাশ্বতী : বোলো না—বোলো না। (মুখ তুলিয়া) ওগো তুমি চলে যাবে, আমি একলা থাকব কি করে ?

মৃত্যুঞ্জয় : কি করবে বল—উপায় তো নেই, নিয়তি—হয়তো তোমারও কোনদিন ডাক পড়বে, তুমি কোথাকার এক মানুষের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মাবে—

শাশ্বতী : (অবসন্নস্বরে) হয়তো তুমি জন্মাবে বাংলা দেশে, আমি জন্মাব তিব্বতে—কেউ কাউকে দেখতে পাব না। তুমি কোন একটা মেয়েকে বিয়ে করবে—

মৃত্যুঞ্জয় : আর তুমি কোন্ একটা তিব্বতী পরিবারে পাঁচ ভায়ের ঘরণী হয়ে বস্‌বে—উঃ ! ভাবলেও অসহ্য মনে হয়।

শাশ্বতী : (সবেগে মাথা নাড়িয়া) না না, কক্ষনো না। আমি এইখানে, এই ঘরে তোমার জন্যে পথ চেয়ে থাকব। আমি মানুষ হয়ে জন্মাতে চাই না।

মৃত্যুঞ্জয় হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসিল।

মৃত্যুঞ্জয় : আমিই কি চাই শাশ্বতী ! স্থূল শরীরের বন্ধন থেকে একবার যে মুক্তি পেয়েছে, সে কি আর ফিরে যেতে চায় ! ভেবে দেখ দেখি, কি সুখে আমরা আছি। শরীরের ক্ষুধা নেই অথচ তৃপ্তি আছে ; বাসনা নেই প্রেম আছে, স্বাধীনতা আছে, অগাধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। এ ছেড়ে কি আবার ঐ অন্ধকূপে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে ? কিন্তু উপায় যে নেই।

শাশ্বতী পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া লইল।

শাশ্বতী : এ জীবনের কেবল ঐ এক দুঃখ—কি জানি কবে ফিরে যেতে হবে। আমরা যেন জেলখানার পালিয়ে যাওয়া আসামী, মুক্তির মধ্যেও সদাই ভয়, কখন আবার ধরা পড়ব।

মৃত্যুঞ্জয় উঠিয়া শাশ্বতীর মুখোমুখি দাঁড়াইল।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ আর ভেবে কি হবে। যেতেই যখন হবে, তখন মন শক্ত করে তৈরী হওয়াই ভাল। তুমি আমাকে ভুলে যাবে না? আমার জন্যে অপেক্ষা করবে?

শাশ্বতীঃ ওকথা বলতে পারলে? ভুলে যাব! আমার মন দেখতে পাচ্ছ না? ভুল্‌ব না—ভুল্‌ব না—যখনই ফিরে আসবে, যতদিন পরে ফিরে আসবে, তোমার শাশ্বতী তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ (শাশ্বতীর চিবুক তুলিয়া) এই ঘরে?

শাশ্বতীঃ (মৃত্যুঞ্জয়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া) হাঁ—এই ঘরে। এ ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। মনে আছে, এই ঘরেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ হ্যাঁ, সে আজ কতদিনের কথা। মানবজন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে শহরের বাইরে একটা নিরিবিলি আস্তানা খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। এই বন-বাদাড়ের মধ্যে বাড়িটা নজরে পড়ল; নেহাৎ ভাঙ্গা বাড়ি নয়, অথচ লোকজনের যাতায়াত নেই—বাড়ির মালিক বাড়িতে তালা দিয়ে বিদেশে ব্যবসা করতে চলে গেছে। দেখেশুনে বেশ পছন্দ হল। ভেতরে ঢুকেই দেখি—তুমি। ঘরও পেলুম, মনের মানুষও পেলুম।

দু'জনে কিছুক্ষণ অতীতের স্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া রহিল। বাইরে পেঁচা ডাকিল—ঘুৎ—ঘুৎ—। চাঁদ ইতিমধ্যে আরও একটু উপরে উঠিয়াছে।

দরজার উপর হঠাৎ ধাক্কা পড়িল; কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

কণ্ঠস্বরঃ মৃত্যুঞ্জয়দা আছেন নাকি? আসতে পারি?

তাড়াতাড়ি বাহুমুক্ত হইয়া শাশ্বতী চোখ মুছিল; মৃত্যুঞ্জয় দ্বারের দিকে ফিরিল।

মৃত্যুঞ্জয় : কে—নিত্যানন্দ ? এস।

নিত্যানন্দ প্রবেশ করিল। হাল্কা বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবী পরা কুড়ি-একুশ বছরের যুবা ; মুখে ছেলেমানুষী ও চটুলতা মাখানো ; চট্‌পটে দ্রুতভাষী রঙ্গপ্রিয়। সে দ্রুতপদে তাহাদের কাছে আসিয়া জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে আক্ষেপসূচক চট্‌কার করিল।

নিত্যানন্দ : খোপের পায়রার মত দু'জনের কূজন-গুঞ্জন হচ্ছে ! হরি হরি ! ওদিকে যে সব গেল।

মৃত্যুঞ্জয় : কী গেল ?

নিত্যানন্দ : তোমাদের এই সাধের পায়রার খোপ—আর কি ? আহা বৌদি, কত যত্ন করে বাসাটি বেঁধেছিলে—'ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী তীরে কপোত মিথুন যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে—' কিন্তু এবার বাসা ছাড়তে হল। বাজপাখী হানা দিয়েছে।

শাশ্বতী : ঐ তোমার দোষ, নিতাই ঠাকুরপো, হেঁয়ালীতে ছাড়া কথা কইতে পার না। সত্যি কি হয়েছে বল না ভাই।

নিত্যানন্দ : শুনবে ? তবে এক কথায় বলছি। এই বাড়ির মালিক এতদিন পরে আবার বাড়ি ফিরে আসছে।

শাশ্বতী ও মৃত্যুঞ্জয় : (যুগপৎ) অ্যাঁ—বল কি !

নিত্যানন্দ : তা- নৈলে আর এমন পূর্ণিমার ভরসন্ধ্যাবেলা তোমাদের মিলন-কুঞ্জে এসে বাগড়া দিলুম ! কি আর বলব বৌদি, ভারি দুঃখ হচ্ছে। কোথাকার একটা চোয়াড়ে পাষণ্ড মানুষ এসে তোমাদের এমন বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত করে দেবে। মানুষের সঙ্গে এক বাড়িতে তোমরা তো আর থাকতে পারবে না।

মৃত্যুঞ্জয় : কিন্তু তুমি এ খবর পেলে কোত্থেকে ?

নিত্যানন্দ : জানোই ত, রোজ সন্ধ্যে বেলা ইস্টিশানের বাদুড়

বটে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা আমার অভ্যেস ; গাড়ি আসে যাত্রীরা ওঠা-নামা করে—দেখতে বেশ লাগে। আজও গিয়ে বসেছিলুম। গাড়ি এল ; একটা লোক চোরের মত গাড়ি থেকে নামল ! দেখেই কেমন খটকা লাগল।—ঢুকে পড়লুম তার মনের মধ্যে। ঢুকে দেখি ও বাবা, মন তো নয়, একেবারে নরককুণ্ড।

শাশ্বতী : কি দেখলে ?

নিত্যানন্দ : ব্যাটা এই বাড়ির মালিক। বিদেশে ব্যবসা করতে গিয়েছিল, সেখানে একটা লোককে খুন করে পালিয়ে এসেছে। মৎলব, এই বাড়িতে লুকিয়ে থাকবে। ব্যাটাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে কিনা।

মৃত্যুঞ্জয় : কী সর্বনাশ ! (শাশ্বতীর দিকে ফিরিয়া) শাশ্বতী—তুমি—

শাশ্বতী : না না, কক্ষনো না—আমি এ বাড়ি ছাড়ব না, আর ও লোকটার সঙ্গেও একবাড়িতে থাকতে পারব না। তোমরা যা হয় একটা উপায় কর।

নিত্যানন্দ : কিন্তু আর সময় নেই—এতক্ষণে ব্যাটা এসে পড়ল। (কান পাতিয়া) ঐ যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না ! হুঁ—এসেছে।

মৃত্যুঞ্জয় : তাই তো, এ আবার এক নতুন ফ্যাঁসাদ।

শাশ্বতী : (দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া) আমি পারব না—পারব না—

নিত্যানন্দ : (ক্ষণেক ঘাড় চুলকাইয়া) ছাখ, এক কাজ করা যাক। ক'জনে মিলে ব্যাটাকে ভয় দেখাই—তাহলে হয়তো পালাবে।

শাশ্বতী : (মুখ তুলিয়া সানন্দে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ !—এস ভয় দেখাই। নিশ্চয় পালাবে তাহলে—

দ্বারের কাছে খুট করিয়া শব্দ হইল। সকলে সেইদিকে চাহিয়া

রহিল। চাঁদ এতক্ষণে জানালার মাথায় উঠিয়াছে। পেঁচা ডাকিল—ঘুৎ।

সন্তর্পণে কালো পর্দা সরাইয়া অমরনাথ মুণ্ড বাড়াইয়া চারিদিকে দেখিল। কিন্তু প্রেতলোকের দীপ্তি মানুষের নয়নগোচর নয়, সে অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না। তখন একটি বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালিয়া সে ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। টর্চের আলো শাশ্বতী, মৃত্যুঞ্জয় ও নিত্যানন্দের গায়ে পড়িল, কিন্তু অমরনাথের নর-চক্ষে তাহারা ধরা পড়িল না। সে তখন আশ্বস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল।

অমরনাথের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ; লম্বা-চৌড়া অথচ ভারি ধরণের চেহারা। মাংসল মুখে বসন্তের দাগ, চুল উস্কখুস্ক; চোখের দৃষ্টি আশঙ্কা ও সতর্কতায় প্রখর। তাহার একহাতে ছোট হ্যাণ্ড-ব্যাগ অন্য হাতে টর্চ; পরিধানে ময়লা ধুতি ও গলাবন্ধ কালো কোট।

অমরনাথ: যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্দি। এখানে পুলিশের বাবাও খুঁজে পাবে না; এ বাড়িটা যে আমার তাই কেউ জানে না। (ঘরের চারিদিকে টর্চের আলো ফেলিয়া) যেমনটি পনের বছর আগে রেখে গিয়েছিলুম ঠিক তেমনটি আছে—(টর্চ নিভাইয়া) কি অন্ধকার! কিন্তু বেশিক্ষণ টর্চ জ্বালা চলবে না তাহলে সেল্ ফুরিয়ে যাবে। মোমবাতি বার করি!

অমরনাথ হাতড়াইয়া ঘরের মধ্যস্থিত টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল; টেবিলের নিকটবর্তী হইয়া একটা চেয়ারে হোঁচট খাইয়া পতনোন্মুখ হইল। নিত্যানন্দ সজোরে হাসিয়া উঠিল।

নিত্যানন্দ: ব্যাটা রাতকানা—শুকনো ডাঙায় আছাড় খাচ্ছিল।

শাশ্বতী: মানুষগুলো তো অমনিই হয়—চোখ থাকতে দেখতে

পায় না, কান থাকতে শুনতে পায় না—তবু বড়াই কত! গুমর ক'রে বলে ওরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব!

অমরনাথ কিন্তু হাসি, কথা কিছুই শুনিতে পায় নাই। হোঁচটের তাল সামলাইয়া সে ব্যাগ ও টর্চ টেবিলের উপর রাখিল, তারপর ব্যাগ খুলিয়া একটি আধপোড়া মোমবাতি বাহির করিয়া জ্বালিল।

অমরনাথ: (টেবিলের উপর মোমবাতি বসাইয়া) জানালাটা খোলা রয়েছে—কিন্তু এ সময় এ বনবাদাড়ে কেউ আসবে না। যদি বা আসে, ভাববে ভুতুড়ে বাড়ি—হা—হা—হা—

অদৃশ্য দর্শক তিনজনও হাসিল। অমরনাথ হাসিতে হাসিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সচকিতভাবে চারিদিকে চাহিল।

অমরনাথ: ঠিক মনে হল কারা যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে হাসছে—বাড়িতে কেউ আছে নাকি?

নিত্যানন্দ: নাঃ—কেউ নেই! তুমি একা রাম-রাজত্ব করছ। ক্যাবলা কোথাকার!

অমরনাথ কিছুক্ষণ শরীর শক্ত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

অমরনাথ: না—বোধ হয় প্রতিধ্বনি। জোরে হেসেছিলুম—

বাহিরে পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল—পিউ—কাঁহা—পিউ কাঁহা—!

অমরনাথ নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

অমরনাথ: আরে ছ্যাঃ, পাপিয়া ডাকছে—তাকেই হাসির আওয়াজ মনে করেছিলুম—হে—হে—হে—

গলার মধ্যে হাসিতে হাসিতে সে জানালার দিকে গেল; নিত্যানন্দের পাশ দিয়া যাইবার সময় নিত্যানন্দ তাহার হাসির সহিত সুর মিলাইয়া ব্যঙ্গস্বরে হাসিল—

নিত্যানন্দ: হে হে হে—

অমরনাথ জানালার নিকট গিয়া বাহিরে উঁকিঝুঁকি মারিল। চাঁদ জানালার উপরে উঠিয়া গিয়াছে—আর দেখা যায় না। অমরনাথ আশ্বস্ত মনে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কোটের বোতাম খুলিতে লাগিল।

অমরনাথঃ জনমানব নেই। মিছে আঁৎকে উঠেছি। কথায় বলে, ঝোপে ঝোপে বাঘ, আমিও তাই দেখছি। না আর ও কথা ভাবব না—একটু একটু ক্ষিধে পেতে আরম্ভ করেছে—ক্ষিধের আর অপরাধ কি? ভাগ্যে বুদ্ধি করে পাঁউরুটি এনেছি—তাই খেয়ে সোফায় লম্বা হয়ে তোফা ঘুমোনো যাবে।

শাশ্বতীঃ ওমা কি ঘেন্না—আমার সোফায় ঘুমোবে!

অমরনাথঃ (আত্মশ্লাঘার স্বরে) বুদ্ধি থাকলে কি না হয়! এই তো খুন করে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে সরে পড়লুম, ধরতে পারলে পুলিশ?

নিত্যানন্দঃ অগাধ বুদ্ধি তোমার।

শাশ্বতীঃ ঠাকুরপো, এবার আরম্ভ কর—আর সহ্য হচ্ছে না!

নিত্যানন্দঃ এই যে—

সে গিয়া ফুৎকারে মোমবাতিটা নিভাইয়া দিল। অমরনাথ টেবিলের দিকে আসিতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

অমরনাথঃ এ কি! বাতি নিভে গেল যে—! (কাছে আসিয়া দেশলাই জ্বালিতে জ্বালিতে) কিন্তু হাওয়া তো নেই! (সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া) গা ছম্‌ছম্ করছে। না, ওসব মনের ভুল। বোধ হয় ঘরটাতে অনেক খারাপ গ্যাস জমা হয়েছে—অনেকদিন বন্ধ আছে কিনা—! ভূত-ফুৎ আমি মানি না।

নিত্যানন্দঃ তা মানবে কেন? তোমার কত বুদ্ধি। বৌদি তোমরাও এস, সবাই মিলে লাগা যাক—

অমরনাথ একটা চেয়ারে বসিয়া ব্যাগ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল; তিনজনে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—শাশ্বতী পিছনে, নিত্যানন্দ ও মৃত্যুঞ্জয় দুই পাশে। অমরনাথ ব্যাগ হইতে একটা আস্ত পাঁউরুটি বাহির করিয়া তাহাতে কামড় দিবার উপক্রম করিল, ঠিক এই সময় শাশ্বতী তাহার ঘাড়ে ফুঁ দিল। অমরনাথ রুটি হাতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমরনাথ : কে—! ঠিক যেন কে ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেললে! একী—এ সব কী? ঘরটা ভাল ঠেকছে না। চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে চারদিকে কারা যেন রয়েছে। পালিয়ে যাব? কিন্তু পালিয়েই বা যাব কোথায়, বেরুলেই তো পুলিশে ধরবে। (ঘাড়ে হাত দিয়া) না—গ্যাস নিশ্চয়। কিম্বা—হয়তো আমার নার্ভ খারাপ হয়ে গেছে। না না, নার্ভ খারাপ হলে চলবে না। খাই, খেলে শরীর ঠিক হবে। খালি পেটে যত আপদ এসে জোটে—

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অমরনাথ পাঁউরুটি খাইতে লাগিল।

শাশ্বতী : উঃ—কি বীভৎস! খাচ্ছে—খাচ্ছে—হাঁউ হাঁউ করে জানোয়ারের মত খাচ্ছে। আমি ও দেখতে পারি না—(মুখ ঢাকিল)

মৃত্যুঞ্জয় : মানুষ—এই মানুষ! রাশি রাশি খাচ্ছে—আর—ছি ছি—!

নিত্যানন্দ : যাকগে যাকগে দাদা, ওসব নোংরা কথা যেতে দিন। —এবার কি করা যায়? ব্যাটার নাক ধরে নেড়ে দিই।

অমরনাথ : (খাইতে খাইতে) কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে। কল্পনা—কল্পনা। মাথা গরম হয়েছে। খেয়েই শুয়ে পড়ি। —উঃ, শুকনো রুটি চিবিয়ে গলা কাঠ হয়ে গেছে। একটু জল পাওয়া যেত—!

নিত্যানন্দ : জলের ভাবনা কি চাঁদু, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি—

নিত্যানন্দ দ্বারের কাছে গিয়া পর্দার ওপারে হাত বাড়াইয়া এক গ্লাস জল আনিল, তারপর জলের গ্লাসটি অমরনাথের মাথার উপর ধরিয়া অল্প অল্প জল ফেলিতে লাগিল।

অমরনাথ : অ্যাঁ—! (উর্ধ্বে চাহিয়া) এ কি—জল—শূন্যে গেলাস—!

রুটি ফেলিয়া দিয়া সে পিছু হটিয়া জানালার দিকে যাইতে লাগিল; নিত্যানন্দ গেলাস তুলিয়া তাহার পিছে পিছে চলিল। শাশ্বতী মোম বাতিটা তুলিয়া লইয়া শূন্যে ঘুরাইতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয় টর্চটা লইয়া অমরনাথের ভয়বিহ্বল মূর্তির উপর আলো ফেলিল।

অমরনাথ : অ্যাঁ—! বাতি শূন্যে ঘুরছে! টর্চ—! ওঃ!

অমরনাথের মুখ ভয়ে বিকটাকৃতি ধারণ করিল। সে হঠাৎ দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া গোঙানির মত শব্দ করিতে করিতে বাঁ দিকের কৌচের পিছনদিকে পড়িয়া গেল। তাহার গোঙানি সহসা স্তব্ধ হইল।

কিছুক্ষণ তিনজনে নীরব; কেবল বাহিরে পেঁচা ডাকিল—ঘুৎ! শাশ্বতী বাতিটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিল; মৃত্যুঞ্জয় টর্চ নিভাইল। নিত্যানন্দ একবার কৌচের পিছনে উঁকি মারিয়া মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া জলের গ্লাস রাখিল। তিনজনে পরস্পর মুখের পানে তাকাইল।

নিত্যানন্দ : (একটু কাসিয়া) তাই তো! একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যেন।

মৃত্যুঞ্জয় : হুঁ। এ আবার হিতে বিপরীত হল। মানুষকে যদি বা তাড়ানো যেত, এখন আর—

সকলে এক সঙ্গে পিছনদিকে তাকাইল।

অমরনাথ কৌচের পিছন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর ঈষৎ টলিতে টলিতে টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু ঢুলুঢুলু, যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে।

তিনজনে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল; নিত্যানন্দ মৃত্যুঞ্জয়কে ইঙ্গিতপূর্ণ কন্নুইয়ের ঠেলা দিল।

মৃত্যুঞ্জয়: কী! কেমন মনে হচ্ছে!

অমরনাথ হাই তুলিতে গিয়া থামিয়া গেল; তাহার চেতনা যেন সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। সে একবার সচকিতে তিনজনের দিকে তাকাইয়া ত্রস্তভাবে পিছু হটিল।

অমরনাথ: কে—কে তোমরা?

নিত্যানন্দ: ভয় নেই—আমরা পুলিশ নয়। দেখছেন না একজন মহিলা রয়েছেন।

অমরনাথ: তবে—তবে—কি চাই?

নিত্যানন্দ: কিছু না। আপনাকে শুধু জানাতে চাই যে, ব্যাপারটা একটু বেশি দূরে গড়িয়েছে; এতদূর গড়াবে আমরা ভাবিনি।

অমরনাথ বুঝিতে পারে নাই, এমনিভাবে তাকাইয়া রহিল; তারপর ঈষৎ আশ্বস্তভাবে এক পা আগাইয়া আসিল।

অমরনাথ: মানে—ঠিক বুঝতে পারছি না।

মৃত্যুঞ্জয়: প্রথমটা অমনিই হয়। আপনি মুক্তি পেয়েছেন।

অমরনাথ: (সাগ্রহে) মুক্তি! মুক্তি পেয়েছি।

নিত্যানন্দ: (সহাস্যে) মানে—একেবারে মুক্তি পেয়েছেন। পটল তুলেছেন—শিঙে ফুঁকেছেন।

অমরনাথ: পাগল না ছন্ন। কে শিঙে ফুঁকেছে?

নিত্যানন্দ : আপনি—আপনি। এখনও ধরতে পারছেন না। —এদিকে আসুন, স্বচক্ষে না দেখলে আপনার বিশ্বাস হবে না দেখছি।

অমরনাথকে লইয়া গিয়া নিত্যানন্দ কৌচের পিছনটা দেখাইল। অমরনাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, তারপর ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। তাহার চেহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে কেমন যেন অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। সে অন্যমনস্কভাবে ফুঁ দিয়া মোমবাতিটা নিভাইয়া দিল।

নিত্যানন্দ : কেমন? এবার বিশ্বাস হল?

অমরনাথ : (আত্মগতভাবে) আমি মরে গেছি। লাস পড়ে রয়েছে। আশ্চর্য! মরে গেছি—কিছুই তো তফাৎ বুঝতে পারছি না। না, না, বুঝতে পারছি—(তাহার মুখ উৎফুল্ল হইতে লাগিল) আর ভয় নেই—আর ভাবনা নেই—আর আমাকে পালিয়ে বেড়াতে হবে না—(দুই বাহু আস্ফালন করিয়া) আমি মরিনি—আমি বেঁচেছি—বেঁচেছি—

অমরনাথ আনন্দে লাফাইয়া লাফাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল না, এই অবকাশে আর একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার যমদূতের মত চেহারা, বড় বড় রক্তবর্ণ চক্ষু, মাথার চুল যেন কোনও গাঢ় তরল পদার্থের সাহায্যে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে একটা ছাই রঙের চাদর; দুই বাহু বুকের উপর আবদ্ধ।

অমরনাথের নৃত্য একটু শ্লথ হইতেই সে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; জ্বলন্ত চক্ষে চাহিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—

আগন্তুক : অমরনাথ, আমাকে চিনতে পার?

অমরনাথ প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া পরে চিনিতে পারিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—

অমরনাথ : অ্যাঁ! এযে অবিনাশ—ওরে বাবারে—

অমরনাথ ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল; অবিনাশ তাহার পিছনে তাড়া করিল—ঘরময় দু'জনের ছুটাছুটি চলিতে লাগিল। নিত্যানন্দ হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।

অবিনাশ : আমাকে খুন করেছিলে—আমার টাকা নিয়ে পালিয়েছিলে—যাবে কোথায়—কেন খুন করেছিলে—

অমরনাথ : ওরে বাবারে—ওরে বাবারে—

এইভাবে ছুটোছুটি করিতে করিতে প্রথমে অমরনাথ ও তৎপশ্চাতে অবিনাশ দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

শাশ্বতী ও মৃত্যুঞ্জয় এতক্ষণ পাশাপাশি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, এই হুড়াহুড়িতে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। নিত্যানন্দ কিন্তু মাতিয়া উঠিয়াছিল—সে মহোৎসাহে দ্বারের পানে যাইতে যাইতে বলিল—

নিত্যানন্দ : ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই! যাই রগড় দেখিগে—

সে দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এমন সময় মৃত্যুঞ্জয় পিছন হইতে বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল—

মৃত্যুঞ্জয় : নিত্যানন্দ!

নিত্যানন্দ : (ফিরিয়া আসিয়া) কি দাদা?

মৃত্যুঞ্জয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

মৃত্যুঞ্জয় : তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। আমার ডাক এসেছে।

নিত্যানন্দের হাসিমুখ মুহূর্তে ম্লান হইয়া গেল।

নিত্যানন্দ : ডাক এসেছে!

মৃত্যুঞ্জয় : হাঁ—আবার যেতে হবে। সময়ও বেশি নেই।—তোমাকে আর কি বলব, শাশ্বতী রইলো মাঝে মাঝে দেখাশুনা করো।

শাশ্বতী আঁচলে চোখ মুছিল। নিত্যানন্দ মুখে প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

নিত্যানন্দ : সে আর বলতে। তুমি কিছু ভেবো না দাদা, আমি আছি, যতদিন না ফিরে আসো আমি যক্ষের মত বৌদিকে আগলে থাকব। ভগবান করুন যেন চট্‌পট্ ফিরে আসতে পারো।

মৃত্যুঞ্জয় : কতদিনে ফিরব তা তো কিছু ঠিক নেই—

নিত্যানন্দ : কিছু বলা যায় না দাদা। আজকাল হতভাগা মানুষগুলোর মধ্যে যে রকম লড়াই বেধেছে—কুরুক্ষেত্র তার কাছে ছেলেখেলা। মানুষ মরে উড়কুড়্ উঠে যাচ্ছে। শুধু কি যুদ্ধ—তার ওপর রকমারি রোগ—দুর্ভিক্ষ। ছেলে বুড়ো কেউ বাদ যাচ্ছে না। ভালয় ভালয় যদি চট্ করে টেঁসে দিতে পার, তবে আর তোমায় পায় কে!

মৃত্যুঞ্জয় : ঐ যা একটু ভরসা।—আচ্ছা তাহলে—

নিত্যানন্দ : এস দাদা। দুর্গা দুর্গা—হাসি মুখে যেন শিগগির ফিরে আসতে পার।

মৃত্যুঞ্জয় : শাশ্বতী—

নিত্যানন্দ সরিয়া গিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। মৃত্যুঞ্জয় ও শাশ্বতী বিদায়-বিধুর মুখে হাত ধরাধরি করিয়া পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এই সময় অবিনাশ ও অমরনাথ হাতে হাতে জড়াজড়ি করিয়া পরম বন্ধুভাবে প্রবেশ করিল।

নিত্যানন্দ : আরে গেল যা, যণ্ডা ছুটো আবার এসেছে। ইঃ—একেবারে গলাগলি ভাব। —বলি, ব্যাপার কি?

অমরনাথ : আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। অবিনাশকে বিনাশ করে আমি ওর কতখানি উপকার করেছি, তা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি।

অবিনাশ : (গদ্‌গদ কণ্ঠে) অমরনাথ, তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু। এখন থেকে দু'জনে একসঙ্গে থাকব, তোমাকে একদণ্ড ছাড়্‌ব না। স্যাওড়াতলার ঐ মজা কুয়োটার মধ্যে আমার আস্তানা দেখলে তো। কেমন, পছন্দ হয় না?

অমরনাথ : পছন্দ হয় না আবার। ঐ তো স্বর্গ—হমীন অস্ত্‌ হমীন অস্ত্‌।

নিত্যানন্দ : আচ্ছা, হয়েছে, এবার একটু থামুন। মৃত্যুঞ্জয়দা'র ডাক এসেছে। উনি এখুনি যাবেন।

অমরনাথ ও অবিনাশ সহানুভূতিপূর্ণ নেত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

অমরনাথ : (সনিশ্বাসে) আহা বেচারা—

তাহারা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের মাঝখানে শাশ্বতী ও মৃত্যুঞ্জয় পূর্ববৎ বদ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের প্রেতদীপ্তি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। মূর্তিগুলি অস্পষ্ট হইয়া ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে মিশিয়া গেল। কিছু আর দেখা যায় না।

নিস্তব্ধ অন্ধকার। সহসা এই স্তব্ধতার মধ্যে বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণ একটি শব্দ ভাসিয়া আসিল—সদ্যোজাত শিশুর কান্না।

ঘড়ি

'আর্য সিকিউরিটি সংঘ' নামক লিমিটেড কোম্পানীর অফিস ভবনে ত্রিতলে একটি সুপরিসর কক্ষ। কক্ষটি বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর মন্ত্রণাগৃহ বা মীটিং রুম। ঘরের মধ্যস্থলে একটি ডিম্বাকৃতি টেবিল ঘিরিয়া কোম্পানীর পাঁচজন ডিরেক্টর বসিয়া আছেন; তিনকড়িবাবু সভাপতি —তাঁহার তিন থাক চিবুক, বড় বড় গোঁফ এবং উন্নত স্তন। ইনি কোম্পানীর হর্তাকর্তা; বাকি চারজন ডিরেক্টর অর্থাৎ রসময় বসাক, প্রাণহরি চৌধুরী, ঝাপড়মল কাপড়িয়া (মারোয়াড়ী) ও চতুর্ভুজ মেহতা (গুজরাতি) ইঁহারা তিনকড়িবাবুর ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শী বাণিজ্য-প্রতিভার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহারই কথায় সায় দিয়া থাকেন। আরও এক বিষয়ে সকলের মধ্যে ঐক্য দেখা যায়—সকলেই স্থূল কলেবর এবং অল্পবিস্তর পীন পয়োধরাঢ্য।

রাত্রিকাল; দেয়ালের ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। ঘড়ির ঊর্ধ্বে দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা A. S. S. Ltd. ঘড়ির নীচে একটি অগ্নি-প্রুফ সিঁদেল-প্রুফ লোহার সিন্দুক। ঘরের বিভিন্ন দেয়ালে চারিটি দরজা; তন্মধ্যে বাঁ-ধারের দরজাটি সদর দরজা, উহা বর্তমানে ভেজানো রহিয়াছে; বাকি দরজা তিনটি দিয়া পাশের ঘর-গুলির কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।

ঝাপড়মল কাপড়িয়া প্রথম কথা কহিলেন। ইনি একজন ভোজন রসিক; প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও অকালে জীবন সম্ভোগ ক্রিয়ায়

অসমর্থ হইয়া পড়ায় ইনি এখন একান্তভাবে ভোজন ও ভুক্তবস্তুর পরিপাকে মনঃসংযোগ করিয়াছেন।

ঝাপড়মল: তিনকৌড়িবাবু, আপ্‌নে আজ রাত্তির বেলা মীটিং কল্‌ করিলেন, হামার আবার নয়টার পর ঘুমালে হোজম হোয় না।

তিনকড়ি: রাত্তিরে মীটিং কল্‌ করবার বিশেষ কারণ আছে ঝাপড়মল্‌ জি; ব্যাপারটা গোপনীয়।

ঝাপড়মল: তো কী গুফ্‌ত গু আছে জলদি জলদি শুরু করিয়ে দেন—রাত তো বহুত হৈল।

তিনকড়ি: এই যে শুরু করি। কিন্তু তার আগে—

তিনকড়িবাবু টেবিলের পাশে বৈদ্যুতিক কল্‌-বেল্‌ টিপিলেন। ঘরের বাইরে কিড়িং কিড়িং শব্দ হইল। কয়েক মুহূর্ত পরে ভেজানো দরজায় টোকা মারিয়া একটি অল্পবয়স্ক শীর্ণকায় কেরাণী প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া ক্ষুধার্ত মনে হয়; হয়তো সেই সকালবেলা আহার করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল, তারপর আর পেটে কিছু পড়ে নাই। তাহার নাম চরণদাস বিশ্বাস; সে তিনকড়িবাবুর সবচেয়ে অনুগত কেরাণী, তাই তাহার অফিসে আসাযাওয়ার সময়ের কিছু ঠিক নাই। মাহিনা পঁ'য়ত্রিশ টাকা। আশায় ভর করিয়া চরণদাস অনন্যমনে প্রভুর সেবা করিয়া চলিয়াছে। প্রভুও ইঙ্গিতে ভরসা দিয়াছেন, এই ভাবে কাজ করিয়া চলিলে কোনও এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে চাকরি পাকা হইতে পারে। চরণদাস তাহাতেই কৃতার্থ—

চরণদাস: আজ্ঞে—?

তিনকড়ি: বিশ্বাস, অফিসে কেউ আছে?

চরণদাস: আজ্ঞে অ্যাকাউন্টেন্টবাবু এতক্ষণ ছিলেন; তাঁর হিসেব মিলছিল না। তিনি এই গেলেন।

তিনকড়ি : এখন তাহলে অফিসে আর কেউ নেই ?

চরণদাস : আজ্ঞে না, সবাই চলে গেছে। আমাকে থাকতে বলেছিলেন—তাই

তিনকড়ি : বেশ—শোনো এখন। তুমি নীচে গিয়ে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকো ! কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন লোক এসে আমার নাম করবে ; ফরসা রং, মাথায় কোঁকড়া চুল, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। সে এলেই বেল্ টিপে আমাদের খবর দেবে—তারপর তাকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে আসবে।

চরণদাস : যে আজ্ঞে—

চরণদাস সন্তর্পণে দরজা ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। প্রাণহরি চৌধুরী একটু অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। বেশি রাত্রি পর্যন্ত বাড়ির বাহিরে থাকিতে তিনি ভালবাসেন না। তাঁহার একটি বাই আছে; গৃহিণীর বয়স চল্লিশ পার হইয়া গেলেও তাঁহার সম্বন্ধে প্রাণহরিবাবুর মন এখনও অসন্দিগ্ধ হয় নাই। রাত্রে বাড়ি ফিরিতে একটু দেরি হইলেই নানাপ্রকার সন্দেহ তাঁহার মনে জটলা পাকাইতে থাকে।

প্রাণহরি : এত লুকোচুরি কিসের—কে লোকটা ? হঠাৎ—

ঝাপড়মল : ওহি তো হামিভি ভাবছে—হ্যাঠাৎ ! তিনকৌড়িবাবু আপ্ হ্যাঠাৎ কোন্ আদমিকো বোলায়া—ক্যা মতলবসে—কুছু পাতা তো বাৎলান ! হ্যাঠাৎ—

চতুর্ভুজ নেহতা এবার কথা কহিলেন। ইহার ধ্যানজ্ঞান সমস্ত জুড়িয়া বসিয়া আছে রেসের ঘোড়া ; তাই তাঁহার প্রত্যেক কথার মধ্যে ঐ চতুষ্পদ জন্তুটির ক্ষুরধ্বনি পাওয়া যায়।

চতুর্ভুজ : এ মানস্ কোন ছে, তিহু শেঠ ? ডার্ক্ হস্ মালুম হোয়।

তিনকড়ি : সেই কথা বলবার জন্যেই তো আজ আপনাদের

ডেকেছি—ডার্ক্ হর্স্ না হলে এত সাবধান হবারই বা কি দরকার ছিল ?

রসময় : হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলবেন চট করে আরম্ভ করে দিন ; আমার আবার সাড়ে নয়টার মধ্যে—

তিনি তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠায় ঘড়ির পানে তাকাইলেন। রসময় বসাক মহাশয় রাত্রিকালে গৃহে শয়ন করেন না, যেখানে শয়ন করেন, সেখানে পৌছিতে দেরি হইলে বেদখল হইবার সম্ভাবনা।

তিনকড়ি : হ্যাঁ, এই যে আরম্ভ করি। ব্যাপারটা বড় জটিল, গোড়া থেকে বেশ গুছিয়ে বলা দরকার—

তিনকড়িবাবু তাঁহার বিপুল দেহভার চেয়ার হইতে উত্তোলিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একটু নাটুকে ভঙ্গীতে বক্তৃতা দিতে ভালবাসেন, এ বিষয়ে স্বর্গীয় নট অমর দত্ত তাঁহার আদর্শ। যৌবন-কালে তিনি সখের অভিনেতা হিসাবে বেশ নাম করিয়াছিলেন। এখন ভীম সাজিতে লজ্জা করে, কিন্তু বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর মিটিং থাকিলেই তিনি সহজ ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ না করিয়া এই ছুতায় একটু নাটকীয় অভিনয় করিয়া লয়েন।

তিনকড়ি : বন্ধুগণ, দেখিতে দেখিতে সুখ-স্বপ্নের মত পাঁচটি বছর কাটিয়া গেল। আমাদের সাধের আর্য সিকিউরিটি সংঘ—যাহাকে আমাদের শত্রুপক্ষ Ass অর্থাৎ গাধা লিমিটেড বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন—সেই গাঁধা লিমিটেড আজ শত্রুর সমস্ত অবজ্ঞা নিষ্কলুষিত করিয়া, শত্রুর ভবিষ্যদ্বাণী ভূমিষ্ঠপাত করিয়া বন্ বন্ শব্দে এরোপ্লেনের মত আকাশে উড়িতেছে—

রসময় : কি মুস্কিল—আসল কথাটা সুরু করুন না ; এদিকে যে ঘড়িতে—

তিনকড়িঃ যে ক্ষুদ্র চারা গাছ আমরা বুকের রক্ত দিয়া রোপন করিয়াছিলাম তাহা আজ আকাশ চুম্বনকারী শাল্মলীতরুর ন্যায় ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। কী করিয়া ইহা সম্ভব হইল? কোন্ অমানুষিক উপায়ে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের পদদলিত করিয়া ব্যবসায় বৃক্ষের মগডালে উঠিতে সমর্থ হইলাম?

ঝাপড়মলঃ সে তো হাম সোবাই জানে—

চতুর্ভুজঃ হ্যাঁ, মুর্দা ঘোড়াকে চাবুক মারিলে কতো দৌড়িবে তিনু ভাই? ইবার নয়ী কহানি শুরু করেন।

তিনকড়িঃ আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, আরম্ভের দিকে আমাদের ব্যবসা ভাল চলিতেছিল না। এই সময় এক বৈজ্ঞানিক ছোকরাকে আমি আপনাদের কাছে লইয়া আসি। এই যুবক এক ডাক্তারি মলম আবিষ্কার করিয়াছিল—যুবতীগণের যৌবন রক্ষার এক অদ্ভুত মুষ্টিযোগ! কিন্তু আপনারা এই যুবকের দুর্ভিক্ষপীড়িত শীর্ণ চেহারা দেখিয়া তাহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। আমি জোর করিয়া তাহার মলম আমাদের সকলের উপর পরীক্ষা করাইয়াছিলাম। ফলে—

প্রাণহরিঃ ফলের কথা আর বলে কাজ নেই।

তিনকড়িঃ কেন কাজ নেই—নিশ্চয়ই আছে। (সাধু ভাষায়) ঔষধের অত্যাশ্চর্য ফল যখন আমাদের সকলের অঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, যখন মলমের মহিমা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রহিল না, তখন আমরা মাত্র দুই শত টাকা মূল্যে ঐ দরিদ্র যুবকের নিকট হইতে তাহার স্বত্ব কিনিয়া লইলাম। সেই দিন হইতে আমাদের ভাগ্য ফিরিয়া গেল; আমাদের শত্রুপক্ষ সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিল। আমরা মলমের নাম রাখিলাম—কুচকাওয়াজ। সেই

কুচকাওয়াজ—আমাদের সাধের কুচকাওয়াজ আজ বাঙলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। হাজার হাজার টাকা মুনফা আমরা কুচকাওয়াজের প্রসাদে অর্জন করিয়াছি। এই যে ইন্দ্রপুরীতুল্য অফিস বাড়ি—যাহার ত্রিতলে বসিয়া আমরা মহানন্দে সভা করিতেছি—এই যে আমাদের দিগ্বিদিক্—অর্থাৎ দিগন্তব্যাপী নাম যশপ্রতিষ্ঠা—এ সকলের মূলে কেবল কুচকাওয়াজ !

রসময় : (অর্ধস্বগত) খেলে কচু, কাজের কথা বলবে না, কেবল কুচকাওয়াজ করে চলেছে। ওদিকে রাত পুইয়ে গেল—

প্রাণহরি : তিনকড়িবাবু, এবার একটু তাড়াতাড়ি আসল কথাটা আরম্ভ করে দিন ; যার আসবার কথা সে হয় তো এতক্ষণ এসে পড়ল—

তিনকড়ি : সংক্ষেপেই তো বলছি। আপনারা একটুতেই হাঁপিয়ে ওঠেন ; আপনাদের মত ব্যস্ত-সমস্ত স্বভাব নিয়ে ব্যবসা করতে যাওয়া বাতুলতা—শাস্ত্রে বলেছে—

প্রাণহরি : জানি জানি, আপনি আবার অন্য কথা আরম্ভ করবেন না ; যা বলেছিলেন তাই বলুন—কুচকাওয়াজ শেষ করুন।

ঝাপড়মল : একটা কোথা পুছ করি, তিনকৌড়িবাবু। ঐ ছোকরাঠো কিধার গিয়া ? উসকো দেকে ঔর একটা মলম যদি তৈয়ার করিয়ে নিতে পারেন তো লাখ লাখ রূপা উপায় হোয়—

তিনকড়ি : তার খোঁজ করিয়েছিলাম ; জানা গেল, ছোকরা যক্ষ্মা রোগে মারা গেছে। (সাধু ভাষায়) কিন্তু মরুক সে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। একজন মরিলে আর একজন আসিবে—ইহাই জগতের নিয়ম। সেই কথাই বলিবার জন্য আজ এই মীটিং আহ্বান করিয়াছি।

চতুর্ভুজ : আহ্‌হা—ডব্‌ল টোট ! তিনু ভাই ডবল্‌ টোট মারিবার মতলব করিয়েছেন—!

তিনকড়ি : হাঁ। আর একটি বৈজ্ঞানিক ছোক্‌রাকে পাকড়াও করিয়াছি। যুবক রুশ দেশে গিয়াছিল ; সেখানে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মন্দির হইতে এক অদ্ভুত আবিষ্কার চুরি করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে—

রসময় : (সপ্রশংস কণ্ঠে) খলিফা ছেলে তো !—রাশিয়ানদের ঘাড় ভেঙেছে—!

প্রাণহরি : কিন্তু চোরাই মাল—

তিনকড়ি : কে জানিবে চোরাই মাল—আমরা উহার পেটেণ্ট লইয়া রীতিমত আইন-সঙ্গতভাবে ব্যবসা করিব। কাহার সাধ্য আমাদের ধরে !

প্রাণহরি : ধরা না পড়লেই ভাল। আবিষ্কারটা কী ?

তিনকড়ি : অদ্ভুত আবিষ্কার—বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ ! আজকাল এই যন্ত্রের যুগে কত রোমহর্ষণ কাণ্ডই না হইতেছে ! আমরা আকাশে উড়িতেছি, সমুদ্রে ডুব-সাঁতার কাটিতেছি, শূন্যে ফসল ফলাইতেছি—কিছুতেই আশ্চর্য হইতেছি না। কিন্তু এই নবীন আবিষ্কারক যে অত্যাশ্চর্য যন্ত্র আমাদের কাছে আনিতেছে, তাহার কথা শুনিলে আপনারা একেবারে চমৎকৃত হইয়া যাইবেন।—ইহা একটি ঘড়ি !

সকলেই উৎসুক হইয়া একটা অভাবনীয় কিছুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ঘড়ি শুনিয়া নিরাশভাবে একবাক্যে প্রতিধ্বনি করিলেন—ঘড়ি !

তিনকড়ি : হাঁ, ঘড়ি। আপনারা অ্যালার্ম ঘড়ির কথা জানেন : দম দিয়া রাত্রে শয়ন করিলে সকালবেলা ঠিক সময়ে ভাঙামঘুইয়া

দেয়! এ ঘড়ি আরও বিস্ময়কর; দম দিয়া শয্যার পাশে রাখিয়া শয়ন করুন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুম পাড়াইয়া দিবে।

সকলে কিছুক্ষণ নির্বাক; তারপর ঝাপড়মল প্রথম কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইলেন।

ঝাপড়মল: আপনে বোলেন কি, তিনকৌড়িবাবু! ঘড়ি হামাকে শুতিয়ে দিবে—এঁ?

রসময়: ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি!

চতুর্ভুজ: তাজ্জব হে! ঘড়িমে ভি ডোপ্ আছে কী?

তিনকড়ি: তা না হলে আর বলছি কি! এই অদ্ভুত আবিষ্কার ছোকরা চুরি করে এনেছে—(সাধু ভাষায়) ভাবিয়া দেখুন এই আবিষ্কারের বিপুল সম্ভাবনা! আজকাল অনিদ্রা রোগ সভ্য মানুষের প্রধান রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; চিন্তা-জর্জরিত কর্মক্লান্ত মানব শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রার আরাধনা করিতেছে, কিন্তু নিদ্রাদেবী দেখা দিতেছেন না। ডাক্তারি ঔষধে কোনই ফল হয় না; উপরন্তু স্নায়ুর জটিলতা বাড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় এই ঘড়ি মৃতসঞ্জীবনী সুধার কাজ করিবে; শয্যায় শয়ন করিয়া ঘড়ি চালাইয়া দিন—ঘড়ি হইতে মৃদু মৃদু স্বর্গীয় সংগীত উত্থিত হইবে—ব্যস্, শুনিতে শুনিতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইবেন। আপনাদের আর অধিক কি বলিব আপনারা জ্ঞানী, গুণী, মনস্বী। এই ঘড়ি বাজারে বাহির হইলে ইহার জন্য কিরূপ কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

প্রাণহরি: সে সব তো পরের কথা। আপনি ঘড়ি পরখ করে দেখেছেন?

তিনকড়ি: পরীক্ষা করিবার জন্যই তো আজ নিশীথকালে এই সভা

আহ্বান করিয়াছি। আপনারা সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখুন ; যুবক ঘড়ি লইয়া এখনি আসিবে ; এইখানেই তাহার পরীক্ষা হইবে।

চতুর্ভুজ : ই তো সারু বাত আছে। ঘোড়া পন্ ঘড়ি দোন্ বরাবর, কেম্ দৌড়ে দেখনেসে পতা লগে।

প্রাণহরি : কত দাম চায় কিছু বলেছে ?

তিনকড়ি : দামের বেলাতেই মোচড় দিচ্ছে, বলে দশ হাজারের কম নেবে না। আর আজ রাত্রেই লেখাপড়া সব শেষ করে ফেলতে চায়। বলে, আপনারা যদি না নেন, অন্য লোক আছে।

রসময় : হুঁ, গরম বেশি দেখছি, রাশিয়া ঘুরে এসেছে কিনা। একবার ওদিকে পা বাড়ালেই বেটাদের মাথা ঘুরে যায়। কুচকাওয়াজের বেলায় কিন্তু—

ঝাপড় : হাঁ, দেখেন না, কুচকাওয়াজ কোত্তো শস্তা মিলা থা—উ তো বিলকুল ফোকটমে মিলা থা !

তিনকড়ি : তা বটে, কিন্তু সব জিনিস তো ফোকটে পাওয়া যায় না ঝাপড়জি। আর এ ঘড়ি যদি সত্যি হয়, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লাভ তো বাঁধা। সে হিসেবে দশ হাজার টাকা জলের দর। তবে যদি আপনারা অমত করেন—

চতুর্ভুজ : নেহি নেহি, তিনুভাই, বাত ই আছে কি অড্‌স যতো ভালা মিলে ওতোই মজা, পন্ যদি না মিলে তো কী উপায় !

তিনকড়ি : তাহলে আপনাদের সকলের মত আছে ?

সকলে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন।

তিনকড়ি : আমি জানতাম আপনাদের অমত হবে না। তাই আগে থাকতেই দলিল তৈরি করিয়ে দশ হাজার টাকা এনে সিন্দুকে

রেখেছি, সে আবার চেক নেবেনা। আজ রাত্রেই এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করে ফেলা ভাল ; নইলে হয়তো হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

এই সময় দ্বারের নিকট বৈদ্যুতিক ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল। তিনকড়ি বাবু উপবেশন করিলেন। আর সকলে উৎসুকভাবে খাড়া হইয়া বসিলেন।

তিনকড়ি : এসে পড়েছে। আপনারা বেশি আগ্রহ দেখাবেন না ; বলা-কওয়া আমিই করব।

ঝাপড়মল : জয় গঁড়েশ !

দ্বার ঠেলিয়া চরণদাস প্রবেশ করিল ; সঙ্গে একটি যুবক। যুবকের ধূতি মালকোঁচা মারা, খদ্দরের পাঞ্জাবির উপর জহরলালী কুর্তা, হাতে একটি ছোট হ্যাণ্ডব্যাগ। যুবকের চেহারায় এমন কোনও বিশেষত্ব নাই ; বাঙলাদেশে এরূপ একটি টাইপ মাঝে মাঝে দেখা যায়। রং ফরসা, মাথার চুল কাফ্রির মত কোঁকড়ানো, তাই সহসা তাহাকে বিরল-কেশ বলিয়া মনে হয় ; মুখের হাড় শক্ত, যেন পেটাই করা।

তিনকড়ি : আসুন মনুজ বাবু। চরণদাস, তুমি নীচে গিয়ে বসো। আর কাউকে ওপরে আসতে দেবে না।

চরণদাস : যে আজ্ঞে—এঁ—বেশি রাত হবে কি ? বাড়িতে মা'র অসুখ ওষুধ নিয়ে যেতে হবে

তিনকড়ি : (ধমক দিয়া) যা বল্‌ছি কর।

চরণদাস : আজ্ঞে—

দীননেত্রে একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল। তিনকড়ি বাবু তখন আগন্তুককে সকলের কাছে পরিচিত করিলেন—

তিনকড়ি : ইনিই হচ্ছেন শ্রীযুক্ত মনুজ কর—রাশিয়া ফেরৎ

বৈজ্ঞানিক; আর এঁরা হচ্ছেন 'আর্য সিকিউরিটি সংঘে'র ডিরেক্টর—শ্রীপ্রাণহরি চৌধুরী, শ্রীচতুর্ভুজ মেহতা, শ্রীরসময় বসাক, শ্রীঝাপড়মল্ কাপড়িয়া।

মনুজ কর একবার নড্ করিল; অন্য পক্ষ কেবল নিষ্প্রাণ মৎস্যচক্ষু মেলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

মনুজ: দরজা বন্ধ করে দিতে পারি?

অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে দরজায় ছিটকিনি লাগাইয়া দিল; তারপর নিকটে আসিয়া হ্যাণ্ডব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল।

মনুজ: আমার যন্ত্র আপনাদের দেখাবার আগে আমি টাকার কথা পাকা করে নিতে চাই। টাকা এনেছেন তো?

তিনকড়ি: হ্যাঁ হ্যাঁ, সেজন্যে আপনি ভাববেন না, টাকা মজুদ আছে—নগদ টাকা। (ইঙ্গিতে লোহার সিন্দুক দেখাইলেন) এখন আপনার যন্ত্র আমাদের পছন্দ হলেই—

মনুজ: যন্ত্র পছন্দ না হয়ে উপায় নেই—হতেই হবে।

মনুজ কর ব্যাগ খুলিয়া একটি ঘড়ি বাহির করিল। নিতান্ত সাধারণ এলার্ম ঘড়ি; যেরূপ ঘড়ি পরীক্ষার সময় মাথার শিয়রে রাখিয়া ছাত্রেরা শয়ন করে। মনুজ ঘড়ির এলার্মে দম দিতে দিতে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল।

মনুজ: আমি তিনকড়ি বাবুকে বলেছিলাম আমার ঘড়ি আপনাদের ঘুম পাড়িয়ে দেবে। কথাটা হয়তো পুরোপুরি সত্যি নয়, তবে এ ঘড়ি আপনাদের মনে চমক লাগিয়ে দিতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। আসলে এটি ঘড়ি নয়—বোমা; যাকে বলে টাইম-বম্!

মনুজ ঘড়িটি টেবিলের মধ্যস্থলে রাখিল। সকলে হতভম্ব হইয়া

ক্ষণকাল সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন; তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনকড়ি: অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

রসময়: আরে খেলে কচু!

ঝাপড়মল: লা হোল্ বিলাকুবৎ!

মনুজ: (শান্তকণ্ঠে) ঘড়িতে দম দিয়ে দিয়েছি, ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে বোমা ফাটবে।

আর কেহ দাঁড়াইলেন না, খোলা দরজাগুলি দিয়া মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কেবল তিনকড়ি বাবু সদর দরজার দিকে দৌড়িয়াছিলেন, মনুজ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

মনুজ: এদিকে নয় ওদিকে; নীচে গিয়ে পুলিশ ডাকবেন সেটি হচ্ছে না। আর সিন্দুকের চাবিটা দিয়ে যান।

তিনকড়ি: বেল্লিক, বদ্‌মায়েস্, বোম্বেটে।

কদর্য গালাগালি দিতে দিতে তিনকড়ি বাবু পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দিলেন এবং অন্যান্য ডিরেক্টরদের মত পাশের একটা ঘরে লুকাইলেন।

চাবি পাইয়া মনুজ আর দেরি করিল না, ক্ষিপ্রহস্তে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। সিন্দুক খুলিয়া দেখিল, সম্মুখেই কয়েক তাড়া নোট রহিয়াছে। সে প্রত্যেকটি তাড়া মোটামুটি গণিয়া লইয়া নিজের ব্যাগে ভরিতে লাগিল। ভরা শেষ হইলে ব্যাগ বন্ধ করিয়া সে একবার চারিদিকে চাহিল; তাহার মুখে একটা কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল। পকেট হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া সে টেবিলে ঘড়ির নীচে চাপা দিয়া রাখিল; তারপর ব্যাগ হাতে লইয়া বহির্দ্বারের পানে চলিল। দ্বারের ছিটকিনি খুলিয়া, ভিতরের দিকে ফিরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে বলিল,—

মনুজ : আপনারা এবার ফিরে আসতে পারেন, আমার কাজ হয়ে গেছে। ঘড়িটা একেবারে অহিংস, নিরামিষ ঘড়ি ; ফাটবে না।

মনুজ উচ্চকণ্ঠে একবার হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিয়ৎকাল ঘর শূন্য। তারপর দরজাগুলির নিকট সন্ত্রস্ত মুণ্ড দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে সকলে সন্তর্পণে ঘরে পদার্পণ করিলেন। সন্দেহ, আশ্বাস, ক্রোধ, কি-জানি-কি-ঘটিবে এমনি একটা স্নায়রিক শঙ্কা মিলিয়া তাহাদের বিচিত্র মনোভাব এবং আনুষঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি বর্ণনা করা অসম্ভব।

তিনকড়ি : গেছে শালা, পাজি; নচ্ছার হারামজাদা!

ঝাপড়মল : চোট্টা ডাকু আওয়ারা!

রসময় : গুণ্ডা বর্গী বোমারু!

প্রাণহরি : সিন্দুক তো ফাঁক্ করে দিয়ে গেছে দেখ্‌ছি।

আর একপ্রস্থ অকথ্য গালাগালি বর্ষণ হইল। সকলেই বিভিন্ন দিক হইতে টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রসময় : যাবার সময় কী বলে গেল ব্যাটা, ঘড়িটা নিরামিষ?

প্রাণহরি : ভুল্‌কুনি দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে গেল, বেইমান ব্যাটাচ্ছেলে!

তিনকড়ি : পুলিশে দেব, জেলে পাঠাব স্কাউণ্ড্রেলকে! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, পীরের কাছে মাম্‌দোবাজী।

চতুর্ভুজ : থাম্বা থাম্বা তিনু শেঠ। চিল্লানেসে কী হোবে? পঞ্ছী তো উড়িয়ে গেল।

প্রাণহরি : হ্যাঁ, এখন কিল খেয়ে কিল চুরি ছাড়া উপায় নেই ; এ কেলেঙ্কারি জানাজানি হয়ে গেলে বাজারে আর মুখ দেখানো যাবে না। পুলিশ হয়তো শেষ পর্যন্ত চোরাই মাল কিন্‌তে গেছলাম বলে আমাদেরই ধরে টানাটানি করবে।

রসময় : ঘড়ির তলায় একটা কাগজ রয়েছে না ?

প্রাণহরি : তাই তো মনে হচ্ছে। তিনকড়িবাবু, দেখুন না, হয়তো কিছু লিখে রেখে গেছে।

তিনকড়ি : আমি দেখব! বেশ লোক তো আপনি! আর ঘড়ি যদি ফাটে—?

রসময় : না না ফাটবে না—নিরামিষ ঘড়ি। ফাটবার হলে এতক্ষণ ফাট্‌ত না ?

তিনকড়ি : বলা যায় না, শয়তান-ব্যাটা হয়তো মৎলব করেই ঘড়ির তলায় চিঠি রেখে গেছে। ঘড়িতে হাত দিলেই—

প্রাণহরি : কিন্তু এ আপনার কর্তব্য ; আপনি আমাদের চেয়ার-ম্যান। আপনি যদি না করেন তখন বাধ্য হয়ে পুলিশ ডাকতে হবে—

রসময় : ঠিক কথা। সিন্নি .দখে এগিয়েছিলেন, এখন কোঁৎকা দেখে পেছুলে চল্‌বে কেন ?

ঝাপড়মল : ডর খাচ্ছেন কেনো, তিনকৌড়িবাবু।—হাম্‌রা ভি তো আছি। এগিয়ে যান—এগিয়ে যান—

হঠাৎ চড়্‌বড়্‌শব্দে ঘড়ির এলার্ম বাজিয়া উঠিল। সকলে উর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটিলেন। কিন্তু ঘড়ি ফাটিল না ; কয়েক সেকেণ্ড পরে এলার্ম থামিয়া গেল। সকলে আবার ফিরিলেন।

প্রাণহরি : দেখলেন তো, নেহাৎ মামুলি এলার্ম ঘড়ি ; ব্যাটা দম দিয়ে রেখে গেছল। নিন্‌, এগোন—কোনও ভয় নেই।

তিনকড়িবাবু সৃক্কনি লেহন করিলেন।

তিনকড়ি :—হুঁ—আচ্ছা—আমি দেখি—

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কয়েকবার হাত বাড়াইয়া এবং হাত টানিয়া লইয়া শেষে তিনকড়িবাবু চিঠিখানি ঘড়ির তলা হইতে উদ্ধার করিলেন। বাকি

সকলে অলক্ষিতে পিছু হটিয়া প্রায় দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ; এখন আবার আসিয়া তিনকড়িবাবুকে ঘিরিয়া ধরিলেন—

চতুর্ভুজ : কাগজ মে স্থুঁ আছে, তিনু ভাই, পোঢ়েন না।

তিনকড়িবাবু চিঠির ভাঁজ খুলিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর বিরাগপূর্ণ কণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

তিনকড়ি : সবিনয় নিবেদন—হুঁঃ !—

প্রথমেই আমার প্রকৃত পরিচয় আপনাদের জানাতে চাই। যে হতভাগ্য যুবকের নিকট হইতে তুই শত টাকা মূল্যে আপনারা কুচ-কাওয়াজের স্বত্ব কিনিয়া লইয়াছিলেন, আমি তাঁহারই ছোট ভাই। আমার দাদার প্রতিভার ফলে আজ আপনারা বড় মানুষ ; আর তিনি অন্নাভাবে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আপনাদের এই রক্তমাখা টাকা আপনারা কিভাবে সদ্ব্যয় করেন তাহাও আমি জানি। তিনকড়িবাবু থিয়েটার দলের অভিনেতা অভিনেত্রীদের পিছনে অজস্র টাকা খরচ করেন—তার উপর রায় বাহাদুর হইবার চেষ্টায়—

ঝাপড়মল : আরে ঠিক পাকড়া হ্যায় !

তিনকড়ি : (ক্রুদ্ধভাবে) হ্যাঁ, খরচ করি। আমার টাকা আমি খরচ করি, কার বাবার কী !

প্রাণহরি : হাঁ হাঁ—তারপর পড়ুন—

তিনকড়ি :—প্রাণহরিবাবু নিজের স্ত্রীকে এখনও সন্দেহ করেন, তাই তাঁহাকে খুশি রাখিবার জন্য মাসে এক হাজার টাকার গহনা ও বস্ত্রাদি কিনিয়া দেন।

সকলের হাস্য।

তিনকড়ি :—শুনুন আরও আছে। চতুর্ভুজ মেহতা রেসের

ঘোড়ার পিছনে বৎসরে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। ঝাপড়মল কাপড়িয়া অকালে শক্তিহীন হইয়া এখন হজমি গুলি ও হকিমি দাওয়াইয়ের জন্য মাসিক দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া থাকেন। রসময় বসাক ইহুদী উপপত্নীকে বারো শত টাকা বেতন দেন—

রসময়ঃ মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা—

ঝাপড়মলঃ বিল্‌কুল ঝুট্—

তিনকড়িঃ যে টাকা আমি আজ লইয়াছি, আপনাদের পক্ষে তাহা কিছুই নয়। কিন্তু শুনিয়া সুখী হইবেন, এই টাকা সৎকার্যে খরচ হইবে। আমি সত্যই একজন বৈজ্ঞানিক; এমন কোনও বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছি যাহাতে টাকার প্রয়োজন। আপনাদের নিকট বা আপনাদের মত অন্য কোনও ধনিকের নিকট হাত পাতিলে আপনারা টাকা দিতেন না; তাই এই উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

এ টাকা আর ফেরৎ পাইবেন না; পরিবর্তে এই ঘড়িটি আপনাদের দান করিলাম। ওটি স্মরণ চিহ্নস্বরূপ রক্ষা করিবেন, হয়তো মাঝে মাঝে সৎকার্যে টাকা খরচ করিবার ইচ্ছা জন্মিতে পারে। ইতি

চিঠি পড়া শেষ হইলে তিনকড়িবাবু দাঁত কড়মড় করিতে করিতে কাগজখানা দু'হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

তিনকড়িঃ শালা! হারামজাদা! আমাদের ঘড়ি দান করেছেন!

ক্রোধান্ধ তিনকড়িবাবু ঘড়িটা তুলিয়া লইয়া মেঝেয় আছাড় মারিবার উপক্রম করিলেন। সকলে সত্রাসে 'হাঁ। হাঁ।' করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

৩ • • •

রসময় : করেন কি ? মাথা খারাপ হয়েছে না কি ?

তিনকড়ি : (থতমত) কেন—কি হয়েছে ?

রসময় : বলা তো যায় না, যদি ওর মধ্যে বোমা-টোমা কিছু থাকেই,—আছাড় মেরে শেষে পেল্লয় ঘটাবেন !

তিনকড়ি সভয়ে ঘড়িটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

প্রাণহরি : এখন কথা হচ্ছে এ ঘড়ি নিয়ে কি করা যায় ! হতে পারে নিতান্ত সহজ ঘড়ি, আবার নাও হতে পারে। এখানে রেখে গেলেও বিপদ ; রাত্রে যদি ফাটে: লঙ্কাকাণ্ড হবে—অফিস বাড়ি কিছুই থাকবে না—

রসময় : জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলে হয না ?

প্রাণহরি : হুঁ, রাস্তায় ফাটুক আর আমবা বাড়িশুদ্ধ হুড়মুড় করে রসাতলে যাই ! আচ্ছা এক ফ্যাচাং লাগিযে রেখে গেল, হতভাগা শযতান ; টাকাকে টাকা গেল তাব ওপর আবার—

সকলেই বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে তিনকড়ি বাবু মুখ হাসি হাসি করিয়া বলিলেন—

তিনকড়ি : দেখুন, আপনাবা মিছে ভয় পাচ্ছেন। ঘড়িটা যে একেবারে গান্ধীমার্কা তাতে সন্দেহ নেই। তা আমি বলি কী, আপনারা কেউ ওটা বাড়ি নিয়ে যান না—

রসময় : (রুক্ষস্বরে) আপনিই নিয়ে যান না ! আপনি তো নাটের গুরু, নিতে হলে আপনারই নেওয়া উচিত—

তিনকড়ি : না না, আপনাদের বঞ্চিত করে আমার নেওয়া উচিত নয়। প্রাণহরিবাবু আপনি ?

প্রাণহরি : বাজে কথা রেখে দিন। আমি বাড়ি চল্‌লাম।

তিনকড়ি : ঝাপড়মলজী ? চতুর্ভুজভাই ? দেখিয়ে, ফোকট্‌মে মিলতা হ্যায় ।

উভয়ে দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িলেন ।

ঝাপড়মল : হামলোক ভি ঘর চলা । বহুত রাত হুয়া, রাম রাম ।

এই সময় বহির্দ্বারে টোকা পড়িল । চরণদাস দরজা ঈষৎ খুলিয়া মুণ্ড বাড়াইল ।

তিনকড়ি : কে—চরণদাস ! কি চাও ?

চরণদাস সঙ্কুচিতভাবে প্রবেশ করিল ।

চরণদাস : আজ্ঞে কিছু নয় । সে-ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হল চলে গেছেন, তাই ভাবলাম মিটিং শেষ হতে কত দেরী আছে—।

তিনকড়িবাবু একবার ঘড়ির দিকে একবার চবণদাসের দিকে তাকাইলেন ; মুহূর্তমধ্যে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল । তিনি গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন—

তিনকড়ি : মিটিং শেষ হয়েছে । চরণদাস, এদিকে এস ।

সঙ্কুচিত উৎকণ্ঠায় চরণদাস নিকটে আসিল ।

তিনকড়ি : আজ মিটিংয়ে আমরা তোমাব কর্মনিষ্ঠা এবং প্রভুভক্তি সম্বন্ধে রেজল্যুশন পাশ করেছি । বোর্ড অফ ডিরেক্টরস খুশি হয়ে তোমাকে এই ঘড়ি উপহার দিয়েছেন ।

চরণদাস এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে একেরারে দিশেহারা হইয়া গেল । গদ্‌গদ কৃতজ্ঞতায় সে অনেক কিছুই বলিতে চাহিল কিন্তু বেশি কিছু মুখ দিয়া বাহির হইল না ।

চরণদাস : আজ্ঞে আপনাদের অনেক দয়া । আপনারা আমার—

তিনকড়িঃ (প্রসন্নকণ্ঠে) হয়েছে হয়েছে। এখন ঘড়ি নিয়ে বাড়ি যাও। এই যে ঘড়ি—নাও, তুলে নাও।

চরণদাস ঘড়ি তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

চরণদাসঃ আমি—আমি আর কি বলব—আপনারা আমার অন্নদাতা—মা-বাপ।

তিনকড়িঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বাড়ি যাও। কার অসুখ বলছিলে—যাও আর দেরি করো না।

চরণদাস আভূমি নত হইয়া কপালে দু'হাত ঠেকাইয়া সকলকে প্রণাম করিল, তারপর কৃতজ্ঞতা বিগলিত মুখে ঘড়িটি বুকে ধরিয়া প্রস্থান করিল।

সকলে পরস্পর মুখের পানে চাহিলেন; সকলের মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল।

১৪ বৈশাখ ১৩৫১

অরণ্যে

স্থান বাংলা দেশ, কাল বর্তমান, বেলা আন্দাজ সাড়ে নয়টা। বনের মধ্যে একটি ভাঙা বাড়ি। বাড়িটি পাকা, কিন্তু বহুদিনের অব্যবহারে অত্যন্ত জীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই বাড়িতে একটিমাত্র বাসোপযোগী ঘর; দেওয়ালের চটা উঠিয়া গিয়াছে, মেঝে অসমতল, উপরে একটা বরগা এক দিক খুলিয়া বিপজ্জনকভাবে ঝুলিয়া আছে। ঘরের দুইটি জানালার কবাটের কব্জা ঢিলা হইয়া গিয়া আপনা-আপনি খুলিয়া আছে—তাহার ভিতর দিয়া রৌদ্রোজ্জ্বল

বৃক্ষসমাকীর্ণ বহিঃপ্রকৃতি ফ্রেমে বাঁধানো সুন্দর নিসর্গচিত্রের মত দেখা যাইতেছে। ঘরেব মধ্যস্থলে একটি নড়বড়ে টেবিল ও চারি পাশে চারিখানি কাঠের জীর্ণ চেয়াব। ঘরের কোণে তিনটি মাঝারি আয়তনের ষ্টীল ট্রাঙ্ক উপবা-উপরি করিয়া রাখা আছে। একটা কাঠের কবাট-যুক্ত দেওয়াল-আলমাবি ঈষৎ খোলা অবস্থাব ভিতরে রক্ষিত অনেকগুলি টেনিস-বলেব মত জিনিস কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিতেছে। একটা বিছানা দেওয়ালের কাছে গুটানো বহিয়াছে। টেবিলের উপর সিগাবেটের টিন ও দেশলাইয়ের বাক্স।

দুইটি চেয়াবে দুইজন লোক বসিয়া আছে। প্রথম ব্যক্তি একটি প্রাচীন গলিতপ্রায় ইংরেজী সংবাদ-পত্র মুখেব সম্মুখে ধরিয়া পাঠ করিতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি চেয়ারে হেলান দিয়া টেবিলের উপর সন্তর্পণে পা তুলিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে ও একটি গানের কলি গুঞ্জন করিতেছে। তাহার বয়স তেইশ চব্বিশ, অল্প পাতলা গোঁফ আছে, মুখখানি চমৎকার ধারালো, বড় বড় স্বপ্নাতুর চোখ, মাথার চুল দীর্ঘ ও ঈষৎ কোঁকড়ানো। তাহাকে দেখিয়া কবিপ্রকৃতির বলিয়া মনে হয়।

যুবক অলসভাবে অর্ধনিমীলিত নেত্রে গুঞ্জন করিতেছিল,—

'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।'

কিছুক্ষণ কাটিবার পর প্রথম ব্যক্তি সংবাদ-পত্র নামাইয়া টেবিলের উপর রাখিল, তখন তাহার মুখ দেখা গেল। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; মুখখানা ভারী, কিন্তু মাংসল নয়, গোঁফদাড়ি কামানো। চিবুক অত্যন্ত চওড়া, ভ্রূর উপরের অস্থি উঁচু, ভ্রূ প্রায় কেশহীন। নাক মোটা, অথচ অস্থিময়। চোখ ছোট ও তীক্ষ্ণ,—হাঁ. বড়। রঙ লালচে গৌরবর্ণ। পিরানে ঢাকা দেহের ঊর্ধ্বভাগ যতটা দেখা যাইতেছে, চওড়া ও মজবুত।

সিগারেটের টিন হইতে একটি সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ

করিয়া লোকটি উর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, সংস্কারের কৈঙ্কর্য্যই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বন্ধন।

দ্বিতীয় লোকটি গান থামাইয়া স্বপ্নভরা চোখ তুলিল, বলিল, নিশ্চয়। সংস্কারের কৈঙ্কর্য্য কাকে বলে?

প্রথম : এটা ভাল, ওটা মন্দ, এই সংস্কার। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া চাই, তবেই সত্যিকার মুক্তি পাবে।

দ্বিতীয় : [একটু চিন্তা করিয়া] বুঝলুম। কিন্তু আমরা যে মুক্তির পথে চলেছি, সেটা তবে কি?

প্রথম : সেটা ছোট মুক্তি, কতকগুলো অনাবশ্যক দুঃখ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেইগুলো ঘাড় থেকে নামাতে চাই।

দ্বিতীয় : কিন্তু তা নামাবার দরকার কি? একেবারে আসল খাঁটি মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়।

প্রথম : তা হয় না। পায়ে কাঁটা বিঁধে থাকলে দৌড়ুতে পারবে না। আগে কাঁটা টেনে বার কর, তারপর শরীর ধাতস্থ হ'লে খাঁটি মুক্তির পেছনে দৌড় দিও।

দ্বিতীয় : তা হ'লে, যতদিন কাঁটা না বেরুচ্ছে, ততদিন ভাল-মন্দর জ্ঞান অর্থাৎ সংস্কার-কৈঙ্কর্য্য রাখতে হবে?

প্রথম : সংস্কারের কিঙ্কর হবার দরকার নেই, লৌকিকভাবে তাকে মেনে চললেই যথেষ্ট। যেমন আমি নিকটিনের কিঙ্কর নই, তবু সিগারেট খাচ্ছি।

দ্বিতীয় : [সহাস্যে টেবিল হইতে পা নামাইল। সন্তর্পণে একটা সিগারেট ধরাইল] আমি কিন্তু ভাল লাগে ব'লেই সিগারেট খাই।

প্রথম : কাজেই সিগারেট না পেলে তোমার কষ্ট হবে।

দ্বিতীয় : তা তো হবেই, হয়ও। কিন্তু কষ্ট সহ্য করি। বিরহী

যেমন প্রিয়ার বিরহ সহ্য করে, তেমনই ভাবে হাহুতাশ করতে করতে সহ্য করি।

প্রথম : এই বিরহের ক্লেশ তোমার থাকত না, যদি মিলনের আকাঙ্খাকে মনে পোষণ না করতে।

দ্বিতীয় : হায় হায় দাদা, মিলনের আশাটাই যদি ছেড়ে দিই, তা হ'লৈ বাঁচব কিসের জোরে ? দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যদি না নামে, বক্ষের দরজায় তা হ'লে বন্ধুর রথ থামবে কেন ? বিচ্ছেদ-বেদনার পূর্ণ পাত্রটি তাঁর হাতে অর্পণ করা যে হবে না।

প্রথম : কববার দরকার হবে না ভাই। বিচ্ছেদের বেদনাই যদিনা থাকে; মিলনের আগ্রহও সেইসঙ্গে উবে যাবে।

দ্বিতীয় : [মাথা নাড়িয়া] আমি তা চাই না, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নহে, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।

প্রথম : অর্থাৎ তুমি বৈষ্ণব হতে চাও, ন্যাড়ানেড়ীর দল।

দ্বিতীয় : না দাদা, বৈষ্ণব হতে চাই না, আমি মুসলমানই থাকতে চাই। কিন্তু তারও ওপবে আমি বাঙালী, বাঙালীব ধর্মই আমার ধর্ম। বাঙালী মুক্ত হতে চায় না দাদা, বাঙালী সুখী হতে চায়।

প্রথম : তাইতেই তো সর্বনাশ হয়েছে।

দ্বিতীয় : হোক সর্বনাশ। সুখী হবার একান্ত চেষ্টাতেই একদিন বাঙালী এ সর্বনাশকে কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু তোমার উপদেশ শুনে সে যদি কেবল উপনিষদের ভূমাকে কামড়ে প'ড়ে থাকে, তা হ'লে শেষ পর্যন্ত তাকে ভূমার বদলে ভূমিকেই কামড়ে পড়ে থাকতে হবে।

প্রথম : তোমার কথা যে একেবারে মানি না, তা নয়। তবে ভয় হয়, পাছে অতি ছোট সুখ পেয়েই মন তৃপ্ত হয়ে থাকে, আরও বড় জিনিসের প্রতি আগ্রহ কমে যায়।

দ্বিতীয় : কমবে না, সে ভয় নেই দাদা। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব—এ লোভ দিন দিন বেড়েই চলবে।

প্রথম : কিন্তু সেটাও তো ভাল নয়।

দ্বিতীয় : সে কথা তখন ব'ল, যখন অপর্য্যাপ্ত সুখের নেশায় বুঁদ হয়ে আমরা প্রকৃত সুখ কি তা ভুলে যাব। এখনও তার সময় হয় নি। এখন—[সুরে] প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।

এই সময় ভেজানো দরজা ঠেলিয়া একটি মেয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। পরিধানে আটপৌরে কালাপেড়ে শাড়ি ও সেমিজ, পা খালি। মেয়েটি কালো, দীর্ঘাঙ্গী, ঈষৎ কৃশ। বয়স উনিশ কিংবা কুড়ি। চোখ দুইটি হরিণের মত আকর্ণবিশ্রান্ত। মাথার ঘন চুল এত কোঁকড়া যে, কবরীবদ্ধ অবস্থাতেও মাথার উপর আঁকাবাঁকাভাবে ঢেউ খেলাইয়া গিয়াছে। দেহ নিরাভরণ, কেবল গলায় একটি সরু সোণার হার আছে। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা শক্তি সমাহিত আছে যে, দেখিলেই তাহাকে অসামান্য বলিয়া বোধ হয়।

গান শেষ হইলে সে বলিল, দেবদা চা খাবে? রান্না নামতে এখনও ঘণ্টা দুই দেরি আছে। জামালদা, তুমি খাবে?

জামাল : [চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল] দাদা, এমন অপূর্ব কথা কখনও শুনেছ? কণাদিদি, এ কি শোনালে? গায়ে যে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে! [সুরে] কি কহব রে সখি আনন্দ ওর—

দেবব্রত : জামাল, তুমি একটা আস্ত পাগল। শান্ত হয়ে ব'স, পাগলামি ক'র না।

জামাল : পাগলামি করব না? আলবৎ করব। এতেও যদি

পাগলামি না করি, তা হ'লে করব কিসে ? আমার গন্ধর্ব-নৃত্য নাচতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু একলা তো ঠিক হবে না, দাদাকেও অনুরোধ করা বৃথা। অতএব কণাদিদি, তুমি এস।

কণা : আমি এখন নাচতে পারব না, আমার অনেক কাজ।

জামাল : অ্যাঁ ! নাচের চেয়ে কাজ বড় হ'ল ? বেশ, তাই হোক, তা হ'লে নাচব না। কিন্তু দিদি, তোমার সংসারে চা আছে, এ খবর আগে দাও নি কেন ?

কণা : আগে দিলে কি এত ফুর্তি হ'ত ?

জামাল : [মহা উল্লাসে] ঠিক। দাদা ! বেদান্ত-দাদা ! তোমার বেদান্ত এবার রসাতলে গেল। কণাদিদি কি বললে, তা শুনতে পেলে ? শুনতে পেলেও বুঝতে পারলে ? যদি না বুঝে থাক, বুঝিয়ে দিচ্চি।

দেবব্রত : জামাল, তুমি একটা—

জামাল : পাগল। ও প্রসঙ্গ একবার হয়ে গেছে, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমি জানতে চাই, তুমি কণাদিদির কথার গূঢ় মর্মবাণী বুঝতে পেরেছ কি না ?

দেবব্রত : পেরেছি। তুমি এখন ক্ষান্ত হও, নয়তো এই দণ্ডে এ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হও।

কণা এতক্ষণ স্মিত মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। সে এবার জোরে হাসিয়া উঠিল।

কণা : জামালদার মনের ভাব তো পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, উনি চা খাবেন। আর তুমি দেবদা ? খাবে নাকি ?

দেবব্রত : খাব, দিও এক পেয়ালা। কিন্তু জামাল, তুমি ওকে 'কণা' ব'লে ডেকো না, অগ্নি ব'লে ডেকো।

জামাল : [শান্ত হইয়া বসিল] ওকে আমার কণাদিদি বলতেই ভাল লাগে।

দেবব্রত : কিন্তু ওর নাম অগ্নি। ও আমাদের আগুন, সাক্ষাৎ অগ্নিদেবতা। ওকে কণা বললে ওর মহিমা খাটো করা হয়।

জামাল : যে আগুন আমাদের বুকের মধ্যে আছে, ও তারই ফুলকি, তাই ওকে কণা বলি। তা ছাড়া ওর নাম শুধু অগ্নি নয়, অগ্নিকণা। অন্যকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ও অন্ধকার রাত্রে আগুনের ফুলকির মত, শুধু আনন্দের দেবতা, দাহনের নয়।

দেবব্রত : দেখ জামাল, তোমার প্রাণটা বড় বেশি ভাবপ্রবণ। ওটা এ পথে ভাল নয়। ভাবপ্রবণতা কাজের ক্ষতি করে।

জামাল : কে বললে ক্ষতি করে? আমার প্রাণে যদি ভাবের উন্মাদনা না থাকত, একটা idea যদি আমাকে পাগল ক'রে না দিত, তাহ'লে আমি সংসারী হতুম দাদা, এ পথে আসতুম না। কিন্তু যাক ওসব বাজে কথা। এখন কথা হচ্ছে, শ্রীমতী অগ্নিকণা দেবী দিদি-ঠাকুরাণীকে 'কণা' বলা যেতে পারে কি না? দাদা বলছেন, বলা উচিত নয়। কণা, তুমি কি বল?

কণা : [ভাবিয়া] আচ্ছা, তুমি একবার আমাকে অগ্নি ব'লে ডাক তো জামালদা।

জামাল : [গাম্ভীর্য-বিকৃত কণ্ঠে] অগ্নি!

অগ্নি : উঁহু, মোটেই ভাল শুনতে হ'ল না। তোমার মুখে 'কণা'ই মিষ্টি শোনায়। দেবদার মুখে যেমন অগ্নি মানায়, তোমার মুখে তেমনই কণা।

জামাল : বাস্। শুনলে তো? রফা হয়ে গেল। এখন তুমি

অগ্নি ব'লে ডাক, আমি কণা ব'লে ডাকি। দুজনে মিলে পুরো পিতৃদত্ত নামটি পাওয়া যাবে।

দেবব্রত: অগ্নিকণা কি ওর পিতৃদত্ত নাম ?

জামাল: তবে ?

দেবব্রত: ওর পিতৃদত্ত নাম জানি না; ও কখনও বলে নি। বোধ হয় আমাদের দলের কেউ জানে না।

অগ্নি: একজন জানে। প্রস্থান করিল

দেবব্রত ও জামাল কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে দরজার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর দুইজনেই নীরবে সিগারেট ধরাইল। প্রায় পাঁচ মিনিট কোন কথা হইল না।

জামাল: [দগ্ধাবশেষ সিগারেট ফেলিয়া দিয়া] দাদা, এখানে তো তিন দিন হয়ে গেল। আর কতদিন ?

দেবব্রত: আজ রাত্রি বারোটার সময় পরেশ আর ভবতোষ আসবে। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি জিম্মা ক'রে দিয়ে তারপর আমাদের ছুটি। থাকতে ইচ্ছে করলে থাকতে পার, কিন্তু না থাকলেও ক্ষতি নেই।

জামাল: পরেশ আর ভবতোষ আজ রাত্রে আসবে। কিন্তু তারা অতগুলো রিভলবার আর বোমা নিয়ে যেতে পারবে ? ভারী তো কম নয়, প্রায় দু'মণ।

দেবব্রত: পারবে। কারণ তারা চাষা সেজে বলদ সঙ্গে ক'রে আসবে।

জামাল: ও। [কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া] তা হ'লে কাল সকালে আমি বেরিয়ে পড়ি। কুমিল্লার কাজটা তো আমারই ওপর পড়েছে। আগে থাকতে গিয়ে জায়গাটা দেখে শুনে রাখা যাক।

দেবব্রত : বেশ, যাও। অগ্নিও তোমার সঙ্গে যাক। তোমাদের এখনও কেউ চেনে না, সন্দেহও করে না, সুতরাং নিরাপদে যেতে পারবে। আমি আর অখিল আপাতত এইখানেই রইলুম ; অন্তত যতদিন না আমার ভাল ক'রে দাড়ি গজায়, ততদিন থাকতেই হবে। আমি একেবারে মার্কামারা, দেখলেই ধরবে।

জামাল : তা বেশ, তোমরা থাক। এ জায়গাটার ওরা বোধ হয় এখনও সন্ধান পায় নি।

দেবব্রত : তাই তো মনে হয়। [ঈষৎ উৎকণ্ঠিতভাবে জানালার বাহিরে তাকাইয়া] আজ অখিলের ফিরতে বড় দেরি হচ্ছে।

জামাল : হ্যাঁ। বোধ হয় বেচারা গাঁয়ে মাছ পায় নি, তাই একেবারে মাছ ধরিয়ে নিয়ে আসছে। আজ প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছিল, যেমন ক'রে হোক মাছ নিয়ে তবে ফিরবে। কণাও বোধ হয় মাছের অপেক্ষায় রান্না চড়াতে দেরি করছে।

দেবব্রত : তাই হবে বোধ হয়।

জামাল : আচ্ছা দাদা, একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ ?

দেবব্রত : কি ?

জামাল : অখিল আর কণার মাঝখানে কেমন একটা দূরত্ব আছে, ওরা ভাল ক'রে মেশে না। কণা আমাদের সকলকে 'দাদা' বলে, কিন্তু অখিলকে অখিলবাবু বলে।

দেবব্রত : হুঁ। অখিল বড় আত্মসমাহিত গম্ভীর, কারুর সঙ্গে ভাল ক'রে মেশবার তার ইচ্ছেও নেই, ক্ষমতাও নেই ; ও শুধু নিজের কাজে ডুবে থাকতে চায়। তা ছাড়া মেয়েমানুষ সম্বন্ধে ওর মনে একটা সঙ্কোচ আছে, তাদের ঠিক আপন ক'রে নিতে পারে না।

জামাল : তা হতে পারে। কিন্তু কণা তাকে দূরে দূরে রাখে কেন ?

দেবব্রত : অগ্নি কাউকে দূরে রাখে না, কাছেও টানে না। ও হচ্ছে আগুন, ওর প্রভা শুধু আমাদের পথ দেখাবার জন্যে।

জামাল : না দাদা, অগ্নি শুধু পথ দেখায় না, পথে চলবার প্রেরণাও আনে। আমার এক এক সময় মনে হয়, ও আমাদের এই মুক্তিসাধনার বীজমন্ত্র, স্নেহে তরল অথচ কর্তব্যে কঠিন, সেবায় নারী কিন্তু বুদ্ধিতে পুরুষ, সত্যের মতন নির্লিপ্ত আবার সৌন্দর্যের মত মোহময়ী। যে আদর্শ এই আনন্দময় মৃত্যুর পথে আমাদের বার করেছে, অগ্নি হচ্ছে তার প্রতিমা।

দেবব্রত : তোমার কবিত্ব বাদ দিলে যা থাকে, অগ্নি তাই বটে।

জামাল : কিন্তু তবু অখিলের সম্পর্কে ওকে দেখলে কেমন খটকা লাগে। মনে হয়, যেন অগ্নির সহজক্রিয়া কাচের চিমনিতে ঢাকা প'ড়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

দেবব্রত : ও তোমার বোঝবার ভুল। আসলে অখিল সর্ব্বদা নিজের প্রাণের মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে, তাই অমন মনে হয়। কিন্তু দরকারের সময় ওদের মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকবে না জেনো।

জামাল : সে আমি জানি। কিন্তু তবু অখিলের জন্যে দুঃখ হয়। এত একাগ্র, এত তন্ময় যে আশেপাশে তাকাবার ওর যেন সময় নেই—এমন আশ্চর্য জীবনটাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতে পেলে না।

দেবব্রত : জীবন উপভোগ করবার প্রণালী সকলের এক নয় জামাল।

জামাল : তাই হবে বোধ হয়। নইলে আজ আমরা চারটি প্রাণী এই জঙ্গলের মধ্যে প'ড়ো বাড়িতে ব'সে লাল চালের ভাত আর আলুনি তরকারি খাচ্ছি কেন?

দুটি কলাই-করা সাদা বাটিতে চা লইয়া অগ্নি প্রবেশ করিল। টেবিলে রাখিতেই জামাল একটা বাটি টানিয়া লইয়া এক চুমুক পান করিয়া মুখ চোখাইল।

জামাল: আঃ। কণা, তুমি হচ্ছ স্বর্গের সাকী; আজ যা খাওয়ালে, এ চা নয়, খাঁটি নির্জলা অমৃত—যা সাগর মন্থন ক'রে উঠেছিল। দাদার নিরাকার পরব্রহ্মের অবস্থা, চিনি ও চিটাতে সমজ্ঞান; কাজেই ওঁর কাছ থেকে প্রশংসা প্রত্যাশা ক'র না। উনি হয়তো বলবেন, চিনি কম হয়েছে, কিম্বা একেবারেই বাদ পড়েছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? অমৃতে চিনি মেশালে কি বেশি সুস্বাদু হয়?

অগ্নি: জামালদা, এইজন্যেই তোমাকে খাইয়ে এত সুখ হয়। চিনি ছিল না তাই দিতে পারি নি—দুধও টিনের। দেবদা, চা খারাপ হয়েছে? [দেবব্রত এমনভাবে ঘাড় নাড়িল, যাহার অর্থ হাঁ না—দুই হইতে পারে] দাঁড়াও, আমার চা-ও নিয়ে আসি। ভাত চড়িয়ে দিয়েছি, এখনও ফুটতে দেরি আছে। প্রস্থান করিল

দেবব্রত: অখিলের আজ বড় দেরি হচ্ছে!

জামাল: ও কিছু নয়—মাছ। যখন প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছে, তখন না নিয়ে ফিরবে না।

অগ্নি চায়ের বাটী লইয়া প্রবেশ করিল ও একটা চেয়ারে বসিল।

অগ্নি: দেবদা, আজ রাত্রে তো ওরা এসে জিনিষপত্রগুলো নিয়ে যাবে—তারপর?

দেবব্রত: তারপর তোমাকে নিয়ে জামাল বেরিয়ে পড়বে, আমি আর অখিল আপাতত এখানেই থাকবো।

অগ্নি: তোমাদের অন্য কোনও কাজ আছে নাকি?

দেবব্রত: না, দাড়ি গজানো ছাড়া আর কোনও কাজ নেই।

অগ্নি ঃ জামালদা তো কুমিল্লায় যাবে। আর আমি ?

দেবব্রত ঃ তুমিও।

অগ্নি ঃ আমার কাজ ?

দেবব্রত ঃ উপস্থিত চুপ ক'রে ব'সে থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। যথাসময় খবর পাবে।

অগ্নি ঃ [চিন্তা করিল] আপাতত মেয়ে-ইস্কুলে মাষ্টারি নিতে পারি ?

দেবব্রত ঃ তা পার। কিন্তু দরকার হ'লেই যাতে ছেড়ে আসতে পার, সে পথ খোলা রেখো।

অগ্নি ঃ বেশ। আর কোনও হুকুম আছে ?

দেবব্রত ঃ না।

একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল। শ্যামবর্ণ, মুখে গোঁফ ও অযত্ন-বর্ধিত খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল রুক্ষ ও ঝাঁকড়া ; ইতরশ্রেণীর লোক বলিয়া মনে হয়, চেহারা দেখিয়া বয়স অনুমান করা কঠিন, পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে যেটা খুশী হইতে পারে। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত ; হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, নগ্ন পদ। মলিন গামছার এক প্রান্তে বাঁধা সওদা কাঁধ হইতে নামাইয়া মাটিতে রাখিল, তারপর চেয়ারে আসিয়া বসিল। জামালের বাটিতে তখনও আধ বাটি চা ছিল। নিঃশব্দে তুলিয়া লইয়া পান করিল। তারপর সিগারেট ধরাইল।

তিনজনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

দেবব্রত ঃ অখিল, পুলিস সন্ধান পেয়েছে ?

অখিল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। জামাল শিস দিবার মত মুখভঙ্গী করিল। অগ্নি নিষ্পলক নেত্রে অখিলের পানে তাকাইয়া রহিল। দেবব্রতের চোয়ালের হাড় শক্ত হইয়া উঠিল।

দেবব্রত : কখন আসছে ?

অখিল : তারা গাঁ থেকে বেরিয়েছে দেখে এসেছি। খুব সাবধানে আসছে, তাই এসে পৌঁছুতে ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে।

দেবব্রত : দিশী পুলিস ?

অখিল : জন কুড়ি আর্মড্ পুলিস, আর সঙ্গে গ্রিফিথ।

দেবব্রত : গ্রিফিথ ?

অখিল : হ্যাঁ, গ্রিফিথ।

কিছুকাল সকলে নীরব।

জামাল : [উঠিয়া] এমন সুযোগ আর হবে না। দাদা, আজ দ্বিতীয় বালেশ্বরের যুদ্ধ দেখিয়ে দেওয়া যাক্। কি বল অখিল ? কি বল কণা ? [দেওয়াল আলমারি হইতে রিভলবার লইয়া টোটা ভরিতে লাগিল।]

অগ্নি : আমারও তাই মত : কিন্তু অখিলবাবুর কি মনে হয় ?

অখিল উত্তর না দিয়া কেবল ঘাড় নাড়িল।

দেবব্রত : পালাবার এখনও অনেক সময় আছে, কিন্তু পালালে চলবে না, তাহলে সমস্ত বোমা রিভলবার পুলিশের হাতে পড়বে। এগুলো নিয়ে পালানোও সম্ভব নয়। তাছাড়া পরেশ আর ভবতোষ আজ রাত্রে আসবে। তারা তো খবর জানে না ; আর খবর দেবার সময়ও নেই।

সকলে চিন্তিতমুখে ভাবিতে লাগিল। জামাল রিভল্বারে টোটা ভরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

দেবব্রত : [সহসা মুখ তুলিয়া] এক উপায় আছে। জামাল, এদিকে এস, মন দিয়ে শোন।

জামাল আসিয়া বসিল।

দেবব্রত : জামাল, তুমি মুসলমান, অগ্নিকেও কেউ চেনে না। তোমরা দুজনে এখানে থাক, আমি আর অখিল আড়াল হই।

জামাল : ঠিক বুঝলুম না দাদা, আর একটু স্পষ্ট ক'রে বল।

দেবব্রত সম্মুখে ঝুঁকিয়া দ্রুত অনুচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিল। চারিটি মাথা কিছুক্ষণ একত্র হইয়া রহিল। শেষে দেবব্রত চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিল।

দেবব্রত : কি বল? এ ছাড়া অস্ত্রগুলো বাঁচাবার আর কোনও উপায় নেই।

অগ্নি ও অখিলের মুহূর্ত্তের জন্য চোখাচোখি হইল। তারপর দুই জনেই ঘাড় নাড়িয়া দেবব্রতের প্রস্তাবে সায় দিল।

জামাল : [বাঁকিয়া বসিয়া] আমি পারব না।

দেবব্রত : [বিস্ফারিত নেত্রে] পারবে না?

জামাল : না। আমি কণাকে 'দিদি' বলেছি।

দেবব্রত : ছিঃ জামাল! ও সব কুসংস্কারের কি এই সময়?

জামাল : আমি পারব না।

দেবব্রত : জামাল, তুমি আমার হুকুম অমান্য করছ?

জামাল : [হস্তস্থিত রিভলবার দেবব্রতের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া] তার শাস্তি নিতে আমি তৈরী আছি।

দেবব্রত : [রিভলবার তুলিয়া লইয়া] হুকুম মানবে না?

জামাল : না, পারব না। অগ্নি আমার দিদি, আমার বোন। ওর গায়ে আমি ওভাবে হাত দিতে পারব না।

দেবব্রত : বেশ, তবে তৈরী হও।

জামাল : [হাসিয়া] আমি তৈরী আছি।

দেবব্রত : [রিভলবার ফেলিয়া দিয়া] Fool! গাধা! আহাম্মক! অভিনয় করতে পারবে না?

জামাল : কেন ? তুমি কিম্বা অখিল অভিনয় কর না।

দেবব্রত : আমাদের যে মানাবে না। গ্রিফিথ পাকা ওস্তাদ, একবার দেখেই ধ'রে ফেলবে।

জামাল : তোমাকে ধরতে পারে. কিন্তু অখিলকে পারবে না। আমাদের মধ্যে মুসলমানের মত চেহারা যদি কারও থাকে তো সে অখিলের।

দেবব্রত অখিলের দিকে চাহিল। অখিল নিঃশব্দে দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিল।

জামাল : ঐ দাড়ি কামিয়ে যদি থুতনির কাছে একটু নূর রেখে দাও, কার সাধ্য বলে যে অখিলের নাম জামালুদ্দিন মিঞা নয়।

দেবব্রত : অখিল, আর সময় নেই। কি বল ?

অখিল : [অগ্নির দিকে ফিরিয়া] কি বল ?

অগ্নি : [হাসিয়া উঠিয়া] কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না। আমার ভয়ে ঘর ছাড়লে তবু নিস্তার নেই। কি আর করবে বল ?

অখিল : [দাড়াইয়া সনিশ্বাসে] আমি রাজি।

জামাল : [উৎসুকভাবে] ব্যাপারটা কি বল তো ? কেমন যেন হেঁয়ালির মত ঠেকছে।

অখিল : [ঈষৎ হাসিয়া] এক কথায় বলা যাবে না। যদি বেঁচে থাকি, আজ রাত্তিরে বলব। এখন চটপট স'রে পড়, তারা এতক্ষণ এসে পড়ল।

অগ্নি : তোমাদের আজ খাওয়া হ'ল না জামালদা।

জামাল : তা না হোক। অখিল, আমার বাক্সে লুঙ্গি আছে, ক্ষুর আয়না চিরুনি সব পাবে। আচ্ছা, চললুম, রাত্রে আবার দেখা হবে। চল দাদা।

দেবব্রত : একটা কথা মনে রেখো অখিল, গ্রিফিথ ভয়ানক ধড়িবাজ, আর সে বাংলা জানে।

বেগে প্রস্থান করিল

অখিল ক্ষুর ইত্যাদি বাহির করিয়া দাড়ি কামাইতে বসিল। অগ্নি দেওয়াল-আলমারি খুলিয়া অস্ত্রগুলো সাবধানে তাকের পিছনে সরাইয়া রাখিয়া, তারপর একটা মশারি তাহার উপর চাপা দিল। চেয়ারগুলো ও টেবিল একপাশে সরাইয়া দিয়া মেঝেয় বিছানা পাতিল। ঘরটাকে গুছাইয়া রান্নাঘর অভিমুখে প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অখিল ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ করিয়া লুঙ্গি ও গোলাপী রঙের গেঞ্জি পরিয়াছে, মাথা তৈলসিক্ত করিয়া চুল আঁচড়াইয়াছে।

অখিল : কেমন দেখাচ্ছে?

অগ্নি : বেশ। [মুখ টিপিয়া হাসিয়া] আমাকে ফেলে পালিয়ে আসার ফল পেলে তো?

অখিল : পেলুম।

অগ্নি : কেন পালিয়েছিলে, বল তো? ভেবেছিলে, আমি তোমায় বাধা দোব?

অখিল : তখন তো তোমাকে এমন ক'রে চিনি নি।

অগ্নি : এখন চিনেছ?

অখিল : চিনেছি।

অগ্নি : এখন কেমন মনে হচ্ছে?

অখিল : মনে হচ্ছে, পালিয়ে এসে ভালই করেছিলাম।

অগ্নি : [কাছে আসিয়া] কেন বল দেখি?

অখিল : [অগ্নিকে জড়াইয়া লইয়া] তা না হ'লে তোমাকে যে এমন ক'রে পেতুম না রাণী!

অগ্নি : [কণ্ঠলগ্না] আমিও যে তোমাকে এমন ক'রে পাব, তা কে জানত ? সব আশা ছেড়ে দিয়েই তো বেরিয়েছিলুম।

কিছুক্ষণ এইভাবে দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল।

অখিল : [সুখস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উৎকর্ণভাবে] ওরা এসে পড়েছে—এস।

শয্যার উপর অগ্নি শয়ন করিল ; অখিল তাহার পাশে কাত হইয়া কনুইয়ে ভর দিয়া শুইয়া মৃদু স্বরে কথা কহিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে তাহার অধর চক্ষু চুম্বন করিতে লাগিল। অগ্নিও থাকিয়া থাকিয়া তাহার গলা ধরিয়া টানিয়া তাহার ওষ্ঠে চুম্বন করিতে লাগিল।

অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলিয়া একজন মিলিটারী বেশধারী সাহেব প্রবেশ করিল, তাহার হাতে রিভল্‌বার। ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইয়া কড়া স্বরে বলিয়া উঠিল, Hands up—both of you. You 're under arrest

অখিল ও অগ্নি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। অগ্নি চীৎকার করিয়া উঠিল, ওমা, আমি কোথা যাব ? এ যে সায়েব !

অখিল : [ভয়কম্পিত স্বরে] তাই তো দেখছি। Who—who are you ?

গ্রিফিথ : You put your hands up first, or my gun might go off. [অখিল দুই হাত তুলিল] Ask your companion to do the same.

অখিল : হাত তোল—সায়েব বলছে। [অগ্নি হাত তুলিল]

গ্রিফিথ : That's good. হুকুম সিং !

জনৈক জমাদার প্রবেশ করিল।

গ্রিফিথ : Handcuff লাগাও। [হুকুম সিং হাতকড়া লাগাইল]

Now search the man. মরদকা অঙ্গা-ঝাড়ি করো। [হুকুম সিং তাহাই করিল] Nothing there ? All right !

অগ্নি : ওগো, কি হবে ? আমাদের কি বেঁধে নিয়ে যাবে ?

অখিল : কি জানি, হয়তো তোমার বাবা পুলিসে খবর দিয়েছেন।

গ্রিফিথ : [চেয়ারে বসিয়া] Now come and sit down here in front of me. [দুইজনে ভয়ে ভয়ে চেয়ারে বসিল] That's right Now tell me who you are.

অগ্নি : ওগো, সায়েব কি বলছে ? আমাদের মেরে ফেলবে না তো ? আমার যে বড্ড ভয় করছে। [কাঁদিতে লাগিল]

গ্রিফিথ : Ask your friend to be quiet.

অখিল : কণা, চুপ কর, সায়েব রাগ করছে।

গ্রিফিথ : What's your name ?

অগ্নি : ওগো নাম জিজ্ঞাসা করছে নাকি ? দোহাই তোমার, নিজের নাম ব'ল না।

অখিল : [অধর লেহন করিয়া] My name is—is অনিলকুমার রায়।

গ্রিফিথ : [মাথা নাড়িয়া] It's no use, young man, come out with the real one. And let me tell you. I know Bengalee. আমি বাংলা জানি।

অগ্নি : ওমা, কি হবে—সায়েব বাংলা জানে ! [মাথায় কাপড় টানিবার চেষ্টা করিল। অখিল মূঢ়বৎ বসিয়া রহিল।]

গ্রিফিথ : এবার আসল নামটি বল তো দেখি।

অখিল : সায়েব, আমার আসল নাম মহম্মদ জামালুদ্দিন।

গ্রিফিথ : জামালুদ্দিন ! Who is this young lady then ?

অখিল : [থতমত] উনি—উনি আমার স্ত্রী।

গ্রিফিথ : মিথ্যে ব'ল না—She is a Hindu girl. [অগ্নিকে] তোমার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ ?

অগ্নি : [লজ্জারুদ্ধ কণ্ঠে] সায়েব, আমি ওর সঙ্গে—ওর সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।

গ্রিফিথ : [শিস দিয়া] I see ! I see ! কোথায় তোমার ঘর ?

অগ্নি : সায়েব, আমায় মেরে ফেল, কেটে ফেল' কিন্তু ও কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারব না। নিজে যা করবার করেছি, বাবার মুখে কালি লাগাতে পারব না।

গ্রিফিথ : [অখিলকে] তোমার বাড়ি কোথায় ?

অখিল : চব্বিশ পরগণায়। এর বেশি বলতে পারব না।

গ্রিফিথ : এই জঙ্গলের মধ্যে তোমরা কি করছ ?

অখিল : লুকিয়ে আছি—তোমাদের ভয়ে।

গ্রিফিথ : [হাসিতে লাগিল] Well, you are a nice pair of lovers ! হুকুম সিং, handcuff খোল দেও।

হুকুম সিং হাতকড়া খুলিয়া দিল।

অগ্নি : সায়েব, আমাদের ছেড়ে দিলে ? আমাদের ধ'রে নিয়ে যাবে না ?

গ্রিফিথ : I was after bigger game. তোমাদের মত চুনোপুঁটির খোঁজে তো আমি আসি নি। আমি খবর পেয়েছিলাম, একদল বিপ্লবী—terrorist এখানে লুকিয়ে আছে।

অখিল : [সভয়ে] বিপ্লবী ! সাহেব আমরা তার কিছু জানি না। আজ তিন দিন হ'ল', আমরা এখানে আছি। আমি ওকে

নিয়ে পালিয়ে এসেছি, এই আমার অপরাধ। বিপ্লবীদের আমি কিছু জানি না।

গ্রিফিথ: It seems I was misinformed—ভুল খবর পেয়েছিলাম। But in any case, আমি তোমাদের জিনিসপত্র তল্লাস ক'রে দেখতে চাই।

অগ্নি: দেখ সায়েব, দেখ, আমাদের বাক্স-প্যাটরা যেখানে যা আছে সব দেখ। আমরা নিরপরাধ।

গ্রিফিথ: Very good. হুকুম সিং, তোম লোগ সবকোই মিলকে দুসরা দুসরা ঘর খানাতল্লাস করো। [হুকুম সিং প্রস্থান করিল] Now let us see what you have got here.

[উঠিল]

অখিল: [অগ্নির নিকট হইতে চাবি লইয়া] এই নাও সায়েব চাবি।

গ্রিফিথ সতর্ক চক্ষে ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে একবার ঘরটা প্রদক্ষিণ করিল। দেওয়াল-আলমারির কবাট খুলিয়া দেখিল, একটি মশারি গুটানো রহিয়াছে।

গ্রিফিথ: What's this? A mosquito net?

অখিল: Yes sir. This jungle is very full of mosquitoes.

অগ্নি: সায়েব, চা খাবেন?

গ্রিফিথ: চা—tea? No, Thank you. This is not my time for tea. দরকার নেই।

অগ্নি: না সায়েব, এক পেয়ালা খেতেই হবে, তোমার নিশ্চয় তেষ্টা পেয়েছে। আমি এখুনি তৈরি ক'রে এনে দিচ্ছি।

গ্রিফিথ: [ইতস্তত করিয়া] Well, if it is no trouble to you, young lady. দাও এক পেয়ালা।

অগ্নি: [কৃতজ্ঞভাবে] আচ্ছা সায়েব, এখুনি আনছি। আপনি আমাদের ওপর এত দয়া করলেন, এটুকুও যদি আপনার জন্যে না করি, তা হ'লে মনে বড় দুঃখ হবে।

প্রস্থান করিল

গ্রিফিথ: [কতকটা নিজ মনে] A pretty siren! Just the sort that finds home dull and dreary. [বাক্স খুলিয়া দেখিতে লাগিল। সর্ব্বশেষের বাক্স হইতে একটি বোতল তুলিয়া লইল] Bless me! What's this?

অখিল: [সাগ্রহে] মদ সায়েব, খাবে?

গ্রিফিথ। By all that's—. but why didn't you tell me? This is real stuff—whisky!

অখিল: একদম ভুলে গিয়েছিলুম সাহেব, তোমার তাড়া খেয়ে কিচ্ছু মনে ছিল না। খাবে?

গ্রিফিথ: Sure we shall take a sip together, though it's not the time. Tell the young lady she needn't make tea. This will do. Bring three glasses.

অখিল: Very Well সায়েব। কাচের গেলাস তো নেই, বাটি আনছি।

প্রস্থান করিল

গ্রিফিথ: [চাবির গোছা-সংলগ্ন কর্কস্ক্রু দিয়া বোতল খুলিতে খুলিতে] They seem to be all right. Just an ordinary case of elopement. But still,—there is something wrong somewhere. What is it? (চিন্তা করিয়া) Well, I shall

test the girl. If she takes the whisky and can stand it, I shall know what to think. A good Hindu girl will never stand whisky.

তিনটি বাটি লইয়া অগ্নি ও অখিলের প্রবেশ। গ্রিফিথ প্রত্যেক বাটিতে একটু করিয়া মদ ঢালিল।

গ্রিফিথ: [অগ্নিকে] I suppose you are used to it? অভ্যাস আছে তো?

অগ্নি মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

গ্রিফিথ: No soda I believe? Well, it does'nt matter. I prefer it raw. Here's to you! [পান করিল]

অখিল: To you [অগ্নি ও অখিল পান করিল]

গ্রিফিথ: [অগ্নিকে] How do you like it? কেমন মনে হচ্ছে?

অগ্নি: চমৎকার সায়েব। আমার নাচতে ইচ্ছে করছে!

গ্রিফিথ: Good Lord! নাচতে ইচ্ছে করছে! But there's no time for that, I'm afraid. [সহাস্যে মাথা নাড়িল]

হুকুম সিং প্রবেশ করিল।

হুকুম সিং: হুজুর, কঁহি কুছ নহি মিলা।

গ্রিফিথ: Oh well, never mind. I didn't expect you would find anything. হুকুম সিং, বিলকুল ঝুঁট খবর মিলা। অব লৌট চলো।

হুকুম সিং: হুজুর!

গ্রিফিথ: Well, so long. Wish you both a very good time.

অখিল : Thank you sir.

অগ্নি : সায়েব, যাচ্ছেন ? [জোড়হাত করিয়া] সায়েব, আমাদের প্রাণের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের ধ'রে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তবু দয়া ক'রে ছেড়ে দিলেন। আপনাকে আর কি বলব—থ্যা—থ্যাঙ্ক্ ইউ।

গ্রিফিথ : Don't thank me young lady, rather thank your own luck that I am after bigger game. [টুপি তুলিয়া] Good-bye ! But look here. You must clear out of this place as quickly as you can [আঙুল তুলিয়া] If ever I come back and find you here still, I shall surely send you up Good day !

অখিল : Good day.

গ্রিফিথ দ্বার পর্যন্ত গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

গ্রিফিথ : [অর্দ্ধস্ফুট স্বরে] Lord ! Four chairs ! [ফিরিয়া] By the way, there is none else with you ?

অখিল : না সায়েব, কেবল আমরা দুজন।

গ্রিফিথ : No servant or anything of the sort ?

অখিল : না সায়েব।

গ্রিফিথ : All right ! Ta ta. [প্রস্থান করিল]

অগ্নি ও অখিল শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে হুকুম সিঙের গলা শুনা গেল—'ফর্ম ফোর্স', 'রাইট টার্ন', 'কুইক মার্চ' জুতার মশমশ শব্দ ক্রমে দূরে মিলাইয়া গেল।

অগ্নি : [কম্পিত কণ্ঠে হাসিয়া] ওগো, আমায় একবার ধর। মাথাটা ঘুরছে।

অখিল : মাথা ঘুরছে ? [অগ্নিকে জড়াইয়া ধরিল]

অগ্নি : [বুকে মাথা রাখিল] মদ গিলেছি, মনে নেই ?

পটক্ষেপ

দ্বিতীয় দৃশ্য

সেই ঘর। গভীর রাত্রি। টেবিলের উপর একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে। দেবব্রত, জামাল ও অগ্নি তিনটি চেয়ারে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে।

অখিল প্রবেশ করিয়া বসিল।

দেবব্রত : পরেশ ভবতোষ চ'লে গেল ?

অখিল : হ্যাঁ তাদের বনের ধার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলুম।

দেবব্রত : যাক, এখন নিশ্চিন্দি। [সিগারেট ধরাইল]

জামাল : যাক। কণাদিদি এখন আসল কথাটা হোক। এতদিন ফাঁকি দিয়েছ. এখন গল্পটা বল।

অগ্নি : কোন্ গল্প ?

জামাল : তোমার আর অখিলের গল্প।

অগ্নি : [অখিলের দিকে ফিরিয়া] তুমি বল।

অখিল : বলবার বিশেষ কিছু নেই। কণা আমার বউ। তবে পুরোপুরি নয়—আধখানা।

জামাল : হেঁয়ালি রাখ—সব কথা খুলে বল।

অখিল : এক শহরেই আমাদের বাড়ি। যখন ইস্কুলে পড়তুম তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ছিল।

জামাল : অর্থাৎ তখন থেকেই ভালবাসা জন্মেছিল।

অখিল : ভালবাসা! কি জানি! যে জন্যে লোকে ভালবাসে —রূপ—তা ওর কস্মিনকালেও ছিল না।

অগ্নি : আর তুমি বুঝি নবকার্তিক ছিলে?

অখিল : না। চেহারায় দুজনেই পরস্পরকে টেক্কা দিতুম, এখনও দিচ্ছি; কিন্তু তা নয়। ওকে ভালবাসতুম কি না বলতে পারি না, তবে ওর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। আর মনে মনে ওকে একটু ভয় করতুম।

জামাল : আর কণাদিদি, তুমি?

অগ্নি : অমন নীরস লোককে কেউ ভালবাসতে পারে? তুমিই বল।

জামাল : তা পারে না, তবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে—যেমন তুমি বেরিয়েছ। তারপর?

অখিল : ক্রমে দুজনে বড় হলুম। আমার মন দুদিকে টানতে লাগল—এক দিকে কণা আর এক দিকে দেশ। ভাল কথা, ওর নাম অগ্নি নয়, ওর সত্যিকারের নাম কনক। যাক, তারপর—অর্থাৎ একদিন—ভাববার সময় পেলুম না—আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। যেন নেশার ঘোরে বিয়ে ক'রে ফেললুম। যেদিন বউ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম, সেদিন চোখ থেকে হঠাৎ ঠুলি খ'সে পড়ল। বুঝলুম, যে বাড়িতে কণা আছে, সে বাড়িতে থেকে আমি অন্য কিছু পারব না, আমার মনের সে জোর নেই। ওর মনের পরিচয় তখনও পাই নি; শুধু ওর একটুখানি হাসি দেখে ওর ভালবাসার ইসারা পেয়েছিলুম—তাই ভয় আরও বেড়ে গেল। কণা, মনে আছে?

অগ্নি : হুঁ।

অখিল : তখনও কুশণ্ডিকা হয় নি। সেই অবস্থাতেই ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে চম্পট দিলুম। পিছু ফিরে তাকালুম না, পিছু ফিরলে আর

যেতে পারতুম না। তারপর দু'বছর কেটে গেল। শেষে একদিন হঠাৎ বরিশালের মিটিঙে কণার দেখা পেলুম। ও তখন আমাদের মধুচক্রের মক্ষিরাণী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর থেকে সবই তোমরা জান।

জামাল: হুঁ। কণাদিদি, এবার তোমার তরফটা শুনি।

অগ্নি: আমার তরফে শোনবার কিছুই নেই। বড় হয়ে অবধি ওঁর সঙ্গে দেখা বড় একটা হ'ত না, যদিও এক পাড়াতেই বাড়ি, কখনও কদাচিৎ দেখা হ'লে উনিও কথা কইতেন না, আমিও না। কিন্তু তবু, ওঁর মনের গতি কোন্ দিকে, তা আমি বুঝতে পেরেছিলুম। কি ক'রে বুঝেছিলুম জানি না, বোধ হয় ভালবাসার যিনি ভগবান তিনিই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাই নিজেকে ওঁর উপযুক্ত ক'রে তৈরি করতে লাগলুম, ভাবলুম, দুজনে মিলে কাজ করব। তারপর বিয়ে হতে না হতেই উনি নিরুদ্দেশ হলেন।

পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর অন্ধকার যখন হাল্কা হ'ল, তখন ভাবলুম, তাতেই বা ক্ষতি কি? উনি যে পথে গিয়েছেন, আমিও তো স্বাধীনভাবে সেই পথে যেতে পারি।

মন ঠিক করতে কিছুদিন গেল। তারপর আমিও একদিন কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে পড়লুম।

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। জামালের চোখ আনন্দের স্বপ্নে আচ্ছন্ন, অগ্নি নিজের মনের অতলে তলাইয়া গিয়াছে, দেবব্রত পাহাড়ের মত নিশ্চল, অখিল অন্যমনস্কভাবে বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আছে।

জামাল: [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] আজ আমাদের কণাদিদির ফুলশয্যা। দাদা, আমরা এখানে কেন? চল, বনে বনে ঘুরে বেড়াইগে।

দেবব্রত: [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] ঠিক কথা। অখিল, অগ্নি, এতদিন

আমি তোমাদের মোড়ল নেতা কর্তা গুরু, যা বল ছিলুম ; মনে ভাবতুম, মোড়ল হওয়ার অধিকার আমার আছে। আজ সে পদবী আমি ত্যাগ করলুম। তোমরা দুজনে আজ থেকে আমাদের গুরু হ'লে। এখন কি করব হুকুম কর।

অখিল ও অগ্নি দেবব্রতকে প্রণাম করিল।

অখিল : দাদা, আপাতত আমাদের বিয়েটা সম্পূর্ণ ক'রে দাও।

দেবব্রত : সে কি ?

অখিল : কুশণ্ডিকা হয় নি যে।

দেবব্রত : পাগল ! কুশণ্ডিকায় তোমাদের দরকার নেই। তোমাদের বিয়ে—সত্যিকারের বিয়ে—অনেক আগে হয়ে গেছে।

অখিল : তা হোক দাদা, তবু তুমি বিয়ে দাও। তুমি পণ্ডিত মানুষ, তোমার মুখ থেকে দুটো সংস্কৃত শ্লোক শুনলেই প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে। জানি, তুমি বলবে—অন্ধ সংস্কারের কৈঙ্কর্য্য। কিন্তু আজ দুপুর থেকে প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না। কণার শরীরটাকে নিয়ে যে ভাবে—, না দাদা, তুমি যা হোক দুটো মন্ত্র আউড়ে দাও—অগ্নি-দেবতা তো সামনেই রয়েছেন।

লণ্ঠনের দিকে ইঙ্গিত করিল

দেবব্রত : বেশ, তোমাদের যখন ইচ্ছে, তখন তাই হোক। কিন্তু কুশণ্ডিকার মন্ত্র তো জানি না। শুধু আধখানা শ্লোক মনে আছে,—তাও নবেল প'ড়ে শেখা। আচ্ছা, তাতেই হবে। অগ্নি, তুমি অখিলের হাত ধর, ওর মুখের দিকে চেয়ে বল—ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মমচিত্তং অনুচিত্তং তেঽস্তু।

অগ্নি : ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্তং অনুচিত্তং তেঽস্তু।

দেবব্রত : অখিল তুমি বল।

অখিল : ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্তমনুচিত্তন্তেহস্তু।

দেবব্রত : বাস্, হয়ে গেল। আমার মন্তরের পুঁজি ফুরিয়েছে।

জামাল : এবার সিঁদুর। এই সময় কপালে সিঁদুর দিতে হয় না ?

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল।

দেবব্রত : সিঁদুর তো নেই।

জামাল : দাদা, শুনেছি সেকালে যবনের আঙুল কেটে রাজা-রাণীর কপালে রাজটীকা পরানো হ'ত। সিঁদুর যখন নেই, তখন সেই ব্যবস্থাই হোক। যবন তো উপস্থিত আছে। [ছুরি দিয়া আঙুল কাটিয়া অগ্নির কপালে রক্তের ফোঁটা দিল। অগ্নি জামালের পদধুলি লইল।]

জামাল : [আঙুল চুষিতে চুষিতে] যাক, শুভকর্ম শেষ। অখিল, **Congratulations !** কণা, চিরায়ুষ্মতী হও। দাদা, চল এবার আমরা অন্তর্হিত হই।

অখিল : সত্যিই যাবে ?

অগ্নি জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

জামাল : আলবৎ যাব। দাদা, আর দেরি নয়, বরকনে কি রকম অধীর হয়ে পড়েছে, দেখছ তো ? বর যদি বা মুখ ফুটে বললেন, সত্যিই যাবে ?—কনের মুখে কথাটি নেই। [প্রস্থানোদ্যত] শুধু একটা জিনিষের অভাব বোধ হচ্ছে—এই সময় রোশনচৌকি থাকত !

বাহিরে বন্দুকের আওয়াজ হইল। জানালার বাহিরের অন্ধকার হইতে গ্রিফিথের কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

গ্রিফিথ : **Hands up, young lady. Don't move, I have you covered.**

অগ্নি ধীরে ধীরে হাত তুলিল। ঘরের মধ্যে মিনিট খানেক

অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। তারপর অখিল মৃদুকণ্ঠে হাসিল।

অখিল: জামাল, রোশনচৌকি খুঁজছিলে না? বাজন্দারেরা এসে পড়েছে। একেবারে গোরার ব্যাণ্ড।

দেবব্রত: যাক, এই ভাল। আমাদের কাজ হয়ে গেছে, এখন মরলেও ক্ষতি নেই। [আলমারির ভিতর হইতে রিভলবার লইয়া অখিল ও জামালকে দিল]

গ্রিফিথ: [বাহির হইতে] Do you surrender ?

দেবব্রত: [গর্জন করিয়া] No, damn you !

অখিল: দাদা, আমাদের দোষ। গ্রিফিথ যে বুঝতে পেরেছে, তা আমরা ধরতে পারি নি।

দেবব্রত: কিছু আসে যায় না অখিল। একদিন তো মরতেই হবে, আজ হ'লেই বা ক্ষতি কি?

গ্রিফিথ: [বাহির হইতে] Listen you ! We have surrounded you, you can't escape. If you don't surrender, we shall kill you all and I shall begin with the lady.

জামাল: No, you won't. তা কি হয় সায়েব? কণা, আমি তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তুমি স'রে যেও। [জামাল পাশ হইতে বিদ্যুদ্বেগে কণার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; কণা সরিয়া গেল। বাহিরে বন্দুকের আওয়াজ হইল। বুকে গুলি খাইয়া জামাল জানালার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল]

জামাল: [উচ্চ হাস্য করিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে] A miss, Griffith ! Now take that and that and that—[গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে জামালের মৃতদেহ মাটিতে এলাইয়া পড়িল]

দেবব্রত : জামাল তো গেল। অখিল, এবার আমাদের পালা।

তখন দুই জানালা দিয়া ঘরে ধারার ন্যায় গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। দেবব্রত ও অখিল জানালার নীচে লুকাইয়া বাহিরে গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। অগ্নি টোটা সরবরাহ করিতে লাগিল।

দেবব্রত প্রথম পড়িল।

দেবব্রত : অগ্নি, যাই—

অগ্নি : এস দাদা [দেবব্রতের মৃত্যু]

অখিল : কণা, আমিও [চিত হইয়া পড়িল]

অগ্নি : [তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া] চললে? চললে? একটু অপেক্ষা করতে পারবে না? একসঙ্গে যেতুম।

অখিল : কণা—এস—[মৃত্যু]

কণা উঠিয়া দাঁড়াইল। অখিলের হাত হইতে রিভল্‌বার লইয়া নিজের খোঁপার মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

কণা : [উচ্চকণ্ঠে] I surrender. আমি ধরা দিচ্ছি।

গ্রিফিথ : [বাহির হইতে] What about the others?

কণা : তারা কেউ বেঁচে নেই।

গ্রিফিথ : Good! Throw down your gun. বন্দুক ফেলে দাও।

কণা : আমার বন্দুক নেই—টোটাও ফুরিয়ে গেছে।

গ্রিফিথ : Good! [বন্দুক হস্তে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া] All the same, you put your hands up, That's right. So you were four after all. You played me a pretty trick this morning, young lady. But I saw through it all right. Now I suppose you are coming quietly with me.

কণা : On the contrary, Griffith, it is you who are coming quietly with me.

গ্রিফিথ : Eh ! What do you mean—coming quietly with you ?

কণা : গ্রিফিথ ! শুধু আমরাই যাব—তুমি যাবে না ?

কণা চুলের ভিতর হইতে ক্ষিপ্রহস্তে রিভলবার বাহির করিল। দুইজনে একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়িল। গ্রিফিথ পড়িল।

কণা টলিতে টলিতে অখিলের বুকের উপর গিয়া পড়িল। অখিলের গলা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিতেই তাহারও প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

রূপকথা

চায়ের দোকানের অভ্যন্তর। ঘরটি বেশ বড়। কয়েকটি মার্বেল্‌টপ্‌ টেবিল ও তদুপযোগী চেয়ার ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ সাজানো। ঘরের অপর প্রান্তে একটি রান্নাঘর—খোলা দ্বারপথে কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। রান্নাঘরের দেওয়ালে টাঙানো সারি সারি সস্‌প্যান ও কাঠের টেবিলের উপর কেট্‌লি পিরিচ পেয়ালা ইত্যাদি আংশিকভাবে দৃষ্টি গোচর হইতেছে।

দোকানের নাম 'ত্রিবেণী-সঙ্গম'। কলিকাতার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের চা ও অনুরূপ খাদ্যপানীয় সরবরাহ করিয়া ইহার সর্ব্বজনপ্রিয় স্বত্বাধিকারী অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

ত্রিবেণী-সঙ্গমের একটি বিশেষ আভিজাত্য আছে—সকল দ্রব্যেরই দাম প্রায় ডবল। সুতরাং সাধারণ চা-খোরদের পক্ষে এস্থান অনধিগম্য, বিত্তবান তরুণ-তরুণীরাই এই 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' সঙ্গত হইয়া থাকেন।

বেলা দু'টা বাজিয়া গিয়াছে—দোকানের এবং সেই সঙ্গে একটি বিরাট উদরের স্বত্বাধিকারী বেণীখুড়ো ওরফে বেণীমাধব চক্রবর্তী একটি লম্বা টেবিলের উপর শয়ন করিয়া পিরাণ ও কাপড়ের ফাঁকে নাভিমণ্ডল উদ্‌ঘাটিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার নাসিকার উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বর একটানা করাতের মত ঘরের স্তব্ধতাকে কর্তন করিতেছে।

দোকানের এক মাত্র ভৃত্য বিদ্যাধর—একাধারে পাচক এবং পরিবেশক—অন্য একটা টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া, চেয়ারের পিছনের পায়া-যুগলের উপর দেহের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া দিয়া মৃদু-মন্দ দুলিতেছে ও একমনে একটি বহুব্যবহারে মলিন ও ছিন্নপ্রায় পত্র পাঠ করিতেছে। বিদ্যাধর যুবাবয়স্ক—দেখিতে সুশ্রী, তাহার গায়ে সস্তা ছিটের পিরাণ, কাপড়ের কোঁচার অংশটা দুপাট করিয়া কোমরে জড়ানো।

বিদ্যাধর চিঠিখানার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বিড় বিড় করিয়া বলিল, —গন্ধ ছিল এখন প্রায় উবে গেছে। জাসমীনের গন্ধ। গুরুমা হলে কি হয়, প্রাণে সখ আছে। (পত্র খুলিয়া পাঠ) 'বন্ধুবর !' ইঃ, যেন বন্ধুবরের জন্য বুক ফেটে যাচ্ছিল। বন্ধুবর না লিখে শুধু বর লিখলেই ত ন্যাটা চুকে যেত। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) না তা লিখবে কেমন করে ? সে ত আর আমি নই, সে যে আর একজন। লিকলিকে চেহারা, ঘাড়ছাঁটা চুল, কোট-সোয়েটার পরা, মেয়েলি মেয়েলি গড়ন—দেখলেই জুতো-পেটা করতে ইচ্ছে করে। মুখখানা পেছন থেকে দেখতে পেলুম না। দেখিনি ভালই হয়েছে! ঘাড়ের

চুলগুলো যেন মুর্গীর বাচ্চার মত, মুখখানাও নিশ্চয় প্যাঁচার বাচ্চার মত হবে। দূর হোক গে! (পত্রপাঠ) 'আমি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, ষাট টাকা মাহিনা পাই। তার উপর সম্পূর্ণ আত্মীয়স্বজনহীনা—বংশমর্যাদাও কিছু নাই। যিনি আমার স্বামী হইবেন তাঁহাকে দিবার মত আমার কিছুই নাই। রূপ ক'দিনের? গুণও নাই। তাই স্থির করিয়াছি ইহজীবনে বিবাহ করিব না। নিঃস্ব ভাবে রিক্ত হস্তে কাহারো গলগ্রহ হইতে চাহি না। ছোট ছোট মেয়েদের গুরুমা হইয়াই আমার জীবন কাটাইতে হইবে। তবে যদি দৈবক্রমে কোনদিন অর্থশালিনী হই, তবেই যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। ইতি

বিনীতা—মঞ্জুষা

—হুঁ! এতদিনে তাঁহার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করা হয়ে গিয়েছে। এখন ত আর ষাট টাকা মাইনের গুরুমাটি নয়—লক্ষপতি। সে বেটাচ্ছেলে নিশ্চয় আরো দুখানা মোটর কিনেছে। এতদিন হয়ত ছেলেপুলে—। দূর! এই ত মোটে তিনমাস! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তিনশ' বছর! চুলোয় যাক গে, আমি ত বেশ আছি। নিজে রোজগার করে খাচ্ছি, কোনো ভাবনা নেই। বেঁচে থাক বেণীখুড়ো আর তার রেস্তোরাঁ!. (কিছুক্ষণ নিদ্রিত বেণীকে নিরীক্ষণ করিয়া) খুড়োর নাকে রসুনচৌকী বাজছে। ওর পেটে বোধ হয় একটা ব্যাগপাইপ লুকোনো আছে—ঘুমলেই বাজতে আরম্ভ করে। (সস্নেহে) খুড়োর আমার ভেতরে-বাইরে সমান—পেটেও ব্যাগপাইপ প্রাণেও ব্যাগপাইপ! অথচ সারাটা জীবন হোটেল করে কাটিয়ে দিলে। এই দুনিয়া! (কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া) কোথায় দিল্লী আর কোথায় কলিকাতা! খুব লম্বা পাড়ি জমানো গেছে. এখানে

চেনা লোকের সঙ্গে খামকা মাথা ঠোকাঠুকি হবার ভয় নেই। তার ওপর যে রকম গোঁফ আর জুলপি গজানো গেছে, দেখা হ'লেও কেউ সহজে চিনতে পারবে না। উপরন্তু গোদের ওপর বিষ-ফোড়া আছে—ইউনিফর্ম। ছদ্মবেশ দিব্যি পাকা রকম হয়েছে। (চিঠিখানা মুড়িতে মুড়িতে) আমি ত খাসা আছি—কিন্তু আর কিছু নয়, মঞ্জুষারাণী কেমন আছেন, কি করচেন তাই জানতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। হয়ত সে বেটা মাতাল—আমার টাকাগুলো নাহক শুঁড়ির বাড়ী পাঠাচ্ছে—ওকে হয়ত যন্ত্রণা দিচ্ছে! যাক গে। যেমন কর্ম তেমনি ফল, আমি আর কি করব? মাতালের শ্রীচরণে যখন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তখন মাঝে মাঝে লাথি-ঝাঁটা খেতে হবে বৈ কি! টাকাগুলো হয়ত এর মধ্যে সব ফুঁকে দিয়েছে, মঞ্জুষারাণী আমার যে গুরুমা সেই গুরুমা। না, অতটা পারবে না। দুলাখ টাকা তিন মাসের মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া সহজ মাতালের কর্ম নয়।—

দেওয়ালে টাঙানো জাপানী ঘড়িতে ঠং করিয়া আড়াইটা বাজিতেই বেণীমাধবের নাসিকাধ্বনি অর্ধপথে হোঁচট খাইয়া থামিয়া গেল। চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিয়া দিগন্তপ্রসারী একটি হাই তুলিয়া তিনি বলিলেন, বিদ্যে ওঠ্ বাবা ওঠ্, আর দেরী করিসনে, আড়াইটে বেজে গেল উননে আগুন দে। এখুনি ছোঁড়াছুঁড়িরা—কি বলে ভাল, ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা আসতে আরম্ভ করবে।

বিদ্যা: তার এখনো ঢের দেরী আছে খুড়ো।

বেণী: না না তুই ওঠ, মাণিক আমার, উনুনে আগুন দিয়ে চায়ের জলটা চড়িয়ে দে। আমার একটু চোখ লেগে গিছল। বলি হ্যাঁরে, আইসক্রীমটা ঠিক করেছিস ত? কাট্‌লেটের মাছ আর মাংস দিয়ে গেছে ত—?

বিদ্যা : হ্যাঁ—

বেণী : তাহলে আর আলস্যি করিস নে বাবা আমার, উঠে পড়্। এই বেলা গোটাকতক ভেজে রাখ তখন গরম করে দিলেই হবে। নইলে ভিড়ের সময় যুগিয়ে উঠতে পারবি নে। ঢাকাই পরটাগুলো—?

বিদ্যা : যাচ্চি খুড়ো, অত তাড়া কিসের! আজ তোমার বেশী খদ্দের হবেনা!

বেণী : (বিরক্ত হইয়া) ঐ তোর ভারি দোষ বিদ্যে, বড় কথা কাটিস। হোটেল করে করে আমার দাড়ি পেকে গেল, তুই আমাকে শেখাতে এসেছিস আজ খদ্দের হবে কিনা। বলি, আজ শনিবার সেটা খেয়াল আছে?

বিদ্যা : আছে, কিন্তু আজ ব্যারাকপুরে রেস আছে সেটাও যে ভুলতে পারছি না খুড়ো!

বেণী : হাত্তোর রেসের নিকুচি করেছে—রোজ রেস রোজ রেস! —আচ্ছা রেসের দিন ছোঁড়াছুঁড়িরা আসেনা কেন বলতে পারিস?

বিদ্যা : রেসে হেরে গিয়ে ভয়ানক মনমরা হয়ে পড়ে কিনা খুড়ো, তাই আসে না। তখন আমার কাটলেটও আর মুখে রোচে না।

বেণী : ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি। তা মাছ মাংস কম করে নিয়েছিস ত?

বিদ্যা : হ্যাঁ—সেজন্য ভেবোনা—

বেণী : (উঠিয়া আসিয়া বিদ্যাধরের চিবুক স্পর্শ করত চুম্বন করিয়া) ভ্যালা মোর বাপ রে। সোনারচাঁদ ছেলে। তোর কাছে মিথ্যা বলবো না বিদ্যে, হোটেল আমি ঢের করেছি কিন্তু কপাল খুলল আমার তোর পয়ে। আজ কাল তোর তৈরী কাটলেট আর

ঢাকাই পরটা খেতে ছোঁড়াছুঁড়ির ভিড় দেখি আর ভাবি, এমন দিনও আমার গেছে যখন কারখানার উড়ে মিস্তিরিদের ভাত রেঁধে খাইয়ে আমার দিন কেটেছে। তখন দিনান্তে পাঁচ গণ্ডা পয়সা আমার বাঁচত। ঝাড়া-হাত-পা রাঁড় মনিষ্যি বলেই পেরেছিলুম, নইলে মাগছেলে নিয়ে হ্যাঙ্গাল্ হয়ে পড়লে কি পারতুম, না এই বুড়ো বয়সে তোর কল্যাণে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেতুম ?

বিদ্যা : (পা নামাইয়া বসিয়া) তবেই বল খুড়ো, আমি না হলে তোমার কিছুই হত না ?

বেণী : কিছু না রে বাবা কিছু না। এই যে সব ভাল ভাল চেয়ার, টেবিল, আসবাব, এত টাকা ভাড়া দিয়ে সহরের মাঝখানে দোকান, এসব স্বপ্নই রয়ে যেত। 'ত্রিবেণী-সঙ্গম' কেবল তোর পয়ে।

বিদ্যা : খুড়ো, এই জন্যেইত তোমায় এত ভালবাসি। অন্য মনিব হলে আমাকেই বোঝাতে চেষ্টা করত যে তার পয়ে আমার কপাল খুলেছে। ভুলেও মানত না যে আমার কোনো কৃতিত্ব আছে, পাছে আমার দেমাক বেড়ে যায়, বেশী মাইনে চেয়ে বসি।

বেণী : দূর পাগল ! ভুল বোঝালে কি ভবি ভোলে রে ? তোর আমার কাছে যতদিন থাকবার ততদিন থাকবি, তারপর যেদিন কাজ ফুরুবে সেদিন কারণে-অকারণে আপনিই চলে যাবি। তোকে আমি ধরেও আনিনি, ধরে রাখতেও পারব না। কেউ কি :তা পারে ? দুনিয়ার এই নিয়ম।

বিদ্যা : রসো খুড়ো, তোমার দর্শনশাস্ত্র শুনবো। এইবার চট করে একটা উননে আগুন দিয়ে আসি।

বিদ্যাধর প্রস্থান করিল। ঘরের এককোণে একটি কাঠের ছোট টেবিল ও টুল রাখা ছিল। টেবিলের উপর বেণী মাধবের ক্যাশবাক্স।

এইখানে বসিয়া তিনি খদ্দেরের নিকট পয়সা গ্রহণ করেন। কসি হইতে চাবি বাহির করিয়া বেণী ক্যাশবাক্স খুলিয়া একটি পুস্তক বাহির করিলেন, তারপর টুলের উপর বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

থেলো হুঁকার উপর কলিকা বসাইয়া ফুঁ দিতে দিতে বিদ্যাধর প্রবেশ করিল।

বিদ্যা: [হুঁকা বেণীমাধবকে দিয়া] এই নাও টানো।—আবার সেই 'শিহরণ-সিরিজ' বার করেছে? এটা কি দেখি—ওঃ একেবারে গুদামে গুমখুন। [উচ্চহাস্য] আচ্ছা খুড়ো এগুলো পড়তে তোমার ভাল লাগে?

বেণী: তা লাগে বাবা, মিথ্যে বলব না। তোর মত পেটে বিদ্যে ত নেই, ইংরেজী খবরের কাগজটা পর্যন্ত পড়তে পারি না। তাই এই সব বইয়ে বিলিতী মেমসাহেবদের কেচ্ছা পড়ে একটু আনন্দ পাই।

বিদ্যা: আমার পেটে বিদ্যে আছে তুমি জানলে কোত্থেকে খুড়ো।

বেণী: জানিরে বাবা জানি, ওকি আর চেপে রাখা যায়। আজকাল লেখাপড়া শিখে গেরস্তর ছেলেদের এই দুর্দশাইত হয়েছে আমি কত সোনার চাঁদ ছেলেকে রাস্তায় রাস্তায় আলুর চপ, গরম ফুলুরী ফেরী করতে দেখেছি। লজ্জায় ভদ্দরলোকের ছেলে বলে পরিচয় দিতে চায় না, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে পিরাণ গায়ে দিয়ে ছোটলোক সেজে বেড়ায়। তুইও সেই দলের। কিন্তু এত লেখা-পড় শিখেও এমন রাঁধতে শিখলি কোত্থেকে সেইটেই বুঝতে পারি না!

বিদ্যা: তা জাননা খুড়ো? ভারতবিখ্যাত পীরুবাবুর্চির নাম শোনো নি কখনো? দেড়শ' টাকা তাঁর মাইনে, রাজা রাজড়া তাঁর হাতের হোসেনী কাবাব খাবার জন্যে লালায়িত। এ-হেন পীরু মিঞা

হচ্ছেন আমার গুরু। দুটি বছর তাঁকে মাইনে দিয়ে রেখে—ওর নাম কি—তাঁর পায়ের কাছে বসে রান্না শিখেছি। রান্নার এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা তিনি—শুক্তুনি থেকে পেঁয়াজের পরমান্ন পর্যন্ত সব রান্নার হুনরী—সকাল বেলা তাঁর নাম স্মরণ করলে পুণ্য হয়। (উদ্দেশ্যে প্রণাম) ভাগ্যে তাঁর কাছে শিখেছিলুম, নইলে আজ আমার কি দুর্দশাই না হত খুড়ো ?

বেণী : আচ্ছা বিদ্যে, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এই তিনমাস আমার কাছে আছিস, একদিনের তরেও ত তোকে বাড়ী যেতে দেখলুম না ? তোর বাড়ী কোথায়—বাপ, মা, ভাইবোন সব আছে ত ! তাদের একবার খোঁজখবর নিস না কেন ? খালি দেখতে পাই, মাঝে মাঝে একখানা চিঠি বার করে বিড় বিড় করে পড়িস। বলি বাড়ী থেকে ঝগড়া-ঝাঁটি করে পালিয়ে আসিস নি ত ?

বিদ্যা : ওসব কথা ছাড়ান দাও খুড়ো। আমার তিনকূলে কেউ নেই, তোমার মত ঝাড়া-হাত-পা লোক। তাই ত তোমার সঙ্গে জুটে গেছি। রতনেই রতন চেনে কি না। তুমি এখন তোমার গুদোমে গুমখুন আরম্ভ কর, আমি একবার ওদিকটা দেখি। এখনি হয়ত লোক এসে পড়বে।

বিদ্যাধর রান্নাঘরের ভিতর প্রস্থান করিল। বেণী হুঁকা টানিতে টানিতে পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিদ্যাধর ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ বলিল,—খুড়ো, একটা গল্প শুনবে ? তোমার শিহরণ সিরিজের চেয়ে ভাল গল্প।

বেণী : [বই মুড়িয়া] বলবি ? আচ্ছা তবে তাই বল্। অনেক ভাল ভাল ইংরিজী বই পড়েছিস সেই থেকে একটা বল শুনি। এমন গল্প বলিস বিদ্যে যেন শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বিদ্যা : আচ্ছা বেশ। [গলা সাফ করিয়া] এক রাজপুত্তুর ছিল—অর্থাৎ কিনা—

বেণী : [করুণ ভাবে] ওরে, এ-যে রূপকথা আরম্ভ করলি বিত্তে! আমার কি আর রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুরের গল্প শোনবার বয়স আছে!

বিদ্যা : রূপকথা নয়, তবে কতকটা আরব্য উপন্যাসের মত বটে। আচ্ছা রাজপুত্তুরকে না হয় ছেড়ে দিলুম,—ধর এক মস্ত বড়মানুষের ছেলে।

বেণী : নাম কি ?

বিদ্যা : [মাথা চুলকাইয়া] নাম ? মনে কর—রণেন্দ্র সিংহ। কেনন, জমকালো নাম কিনা ? তোমার 'গুদামে গুমখুনে' এমন নাম আছে ?

বেণী : না,—তারপর বল—

বিদ্যা : কি আশ্চর্য খুড়ো, এতদিন লক্ষ্য করিনি! কিন্তু আমাদের সাধারণ বাঙালীর ঘরে সময় সময় এমন এক একটা নাম বেরিয়ে পড়ে যা 'দুর্গেশনন্দিনী' 'জীবনপ্রভাত' খুঁজলেও পাওয়া যায় না। 'রণেন্দ্র সিংহ' শুনলে মনে হয় না যে, নামটা একখানা আনকোরা ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে পেড়ে এনেছে ? অথচ—সে যাক, এখন গল্পটা শোনো। এই রণেন্দ্র সিংহের অনেক টাকা; বাপ-মা ভাই-বোন কেউ নেই। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ—চেহারা মোটের উপর মন্দ নয়, অন্ততঃ ছেলেপুলে অন্ধকারে দেখলে ডরিয়ে ওঠে না। তার বিয়ে হয়নি, কারণ বাপ বিয়ে দেবার আগেই মারা গেছেন। রাজধানীতে সাতমহল বাড়ীতে একলা থাকে, কারুর তোয়াক্কা রাখে না। যেন একটি ছোটখাট নবাব।

এ হেন রণেন্দ্র সিংহ একদিন এক মেয়ে ইস্কুলের গুরুমার সঙ্গে—খুড়ী—এক ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেল। ঘুঁটে কুড়ুনী মেয়ে দেখতে ঠিক একটি রজনীগন্ধার কুঁড়ির মত। বলি, রজনীগন্ধার কুঁড়ি দেখেছ ত ?

বেণী : দেখেছি রে বাপু, হগ সাহেবের বাজারে ফুলের দোকানে। তুই বলে যা না।

বিণ্টে : রণেন্দ্র সিংহ সেই রজনীগন্ধার কুঁড়ির প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। শেষে তার এমন অবস্থা হল, যে, মেয়ে-ইস্কুল না হয়ে যদি ছেলে-ইস্কুল হত তাহলে পোড়ো সেজে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে পড়তেও সে দ্বিধা করত না—ঐঃ যা। কি বলতে কি বলে ফেল্‌ছি খুড়ো, আমার মাথাটা গুলিয়ে গেছে। ঘুঁটে-কুড়ুনী মেয়ের কথা বলতে কেবলি গুরুমা'র কথা বলে ফেলছি—

বেণী : তা হোক, আমার বুঝতে একটুও কষ্ট হবে না। তুই বলে যা।

বিণ্টে : যা হোক, অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে রণেন্দ্র সিংহ শেষে মেয়েটির সঙ্গে ভাব করলে। মেয়েটির নাম—ধর মঞ্জুষা। দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হল। ক্রমে রোজ সন্ধ্যাবেলা মেয়েটির কুঁড়ে ঘরে দুজনের দেখা হতে লাগল। হাসি-গল্প, গান, চা চকোলেটের ভিতর দিয়ে বন্ধুত্ব বেশ প্রগাঢ় হয়ে উঠল। দূর থেকে দেখেই রণেন্দ্র সিংহ যাকে ভালবেসেছিল, এত কাছে পেয়ে তার প্রেমে একেবারে ডুবে গেল। নিজের বলে তার আর কিছু রইল না।

এমনি ভাবে মাস দুই কাটবার পর রণেন্দ্র সিংহ একদিন মঞ্জুষার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে। মঞ্জুষা রাণীর মুখখানি লাল হয়ে উঠল, —এক মুহূর্তে রজনীগন্ধার কুঁড়ি ডালিম ফুলের কুঁড়িতে পরিণত হল।

তারপর কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে থেকে বললে—'না।' রণেন্দ্র সিংহের বুকের রক্ত থেমে গেল, সে জিজ্ঞাসা করলে,—কারণ জান্‌তে পারি কি ?

মঞ্জুষা বললে,—'চিঠিতে জানাব।'

খালি বুক নিয়ে রণেন্দ্র সিংহ তার সাঁতমহল বাড়ীতে ফিরে এল।

পরদিন মঞ্জুষার চিঠি এল। সে লিখেছে—সে গরীব মেয়ে, বড় মানুষের ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে না। এমন কি বিয়ে করতেই তার ঘোর আপত্তি। তবে যদি ভগবান কখনো তাকে টাকা দেন তখন সে যাকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করবে—নচেৎ বিয়ে-থাওয়ার কথা ঐ পর্যন্ত!

চিঠি পড়ে আহ্লাদে রণেন্দ্র সিংহের বুক নেচে উঠল; সে তখনি ছুটল উকিলের বাড়ী। উকিলকে দিয়ে এক দলিল তৈরী করালে। নিজের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নগদ টাকাকড়ি যা ছিল সব ঐ ঘুঁটে কুড়ুনি মেয়ের নামে দানপত্র করে দিলে। তারপর দানপত্র হাতে করে সন্ধ্যে বেলা মেয়েটির বাড়ী গিয়ে হাজির হল।

বাড়ীতে ঢোকবার আগেই রণেন্দ্র সিংহ দেখতে পেলে, দোতলার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মঞ্জুষাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কে একজন তাকে চুমু খাচ্ছে। জানলা দিয়ে তাদের কোমর পর্যন্ত দেখা গেল। যে লোকটা চুমু খাচ্ছে তার সরু লিকলিকে চেহারা, ঘাড়ে ছাঁটা চুল, গায়ে কোট-সোয়েটার। রণেন্দ্র সিংহ তার মুখ দেখতে পেলে না; পা টিপে টিপে চোরের মত বাড়ী ফিরে গেল।

সে রাত্তিরটা রণেন্দ্র সিংহ ঘুমোতে পারলে না। পরদিন সকালে উঠে রেজেষ্ট্রী করে দানপত্রটা ঘুঁটেকুড়ুনি মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়ে সে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ল।

বেণী: সব দিয়ে দিলি? দানপত্রটা ছিঁড়ে ফেললি না? দূর আহাম্মক।

বিদ্যা: রণেন্দ্র সিংহটা ঐ রকম আহাম্মক ছিল, সব দিয়ে দিলে। ভাবলে টাকা পেলেই যখন মেয়েটা যাকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করতে পারবে তখন তাই করুক।

বেণী: হাঁদাগোবিন্দ রণেন্দ্র সিংগির কি দুর্দশা হল?

বিদ্যা: কি জানি। হাঁদাগোবিন্দদের যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে বোধ হয়? পথে পথে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেণী: আর মেয়েটা?

বিদ্যা: সে এখন বিয়ে-থা করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে আর মাতালটার লাথি-ঝাঁটা খাচ্ছে। এতদিনে রণেন্দ্র সিংহের টাকাগুলো প্রায় শেষ করে এনেছে।

বেণী: মাতাল, টাকা উড়িয়ে দিয়েছে,—এত খবর তুই জানলি কি করে?

বিদ্যা: এর আর জানাজানি কি? এ'ত দিব্যচোক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

বেণী: [বহুক্ষণ হুঁকায় টান দিয়া শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া] তোর গল্প একদম বাজে, শেষের দিকে মন একেবারে থিঁচড়ে যায়। তার চেয়ে আমার শিহরণ-সিরিজ ঢের ভাল; শেষ পাতায় নায়ক-নায়িকা চুমু খেয়ে মনের সুখে ঘরকন্না করে। [সহসা হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া বিদ্যাধরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া] তবে কি জানিস রে বাবা, মরদের বাচ্চা—কিছুতেই দমতে নেই। কোথাকার ঘুঁটে-কুড়ুনী মেয়ে নিজের মাথা খেয়ে ফিরে চাইলে না বলে কি প্রাণটাকে তাচ্ছিল্য করে নষ্ট করে ফেলতে হবে? আবার দেখবি; কত রাজার মেয়ে ঐ রণেন্দ্র

সিংগির জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইস্কুলের মাস্টারণী কদর বুঝলে না বলে কি মণিমুক্তোর দাম কমে যাবে! দেখিস, ঐ রণেন্দ্র সিংগির একদিন রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে হবে।

বিদ্যা: তা যদি হতে পারত খুড়ো তাহলে ত কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু দুঃখের কথা কি ব'লব তোমাকে রণেন্দ্র সিংহটা এমনি আহাম্মক যে ঐ ঘুঁটে-কুড়ুনী মেয়ে ছাড়া আর কাউকে চায় না। রাজ-কন্যার ওপর তার একটুও নজর নেই।

বেণী: বিদ্যে, যা বাবা তুই কাটলেট ভাজগে যা। আর বুড়ো-মানুষকে দুঃখ দিসনে। তোর গল্প আর আমি শুনতে চাই না।

এই সময় দোকানের সামনে একটি মোটর আসিয়া থামিল। বেণী উঁকি মারিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি দেয়ালে টাঙানো একটি কালো রঙের গলবন্ধ কোট পরিধান করিতে করিতে বলিলেন,—'বিদ্যে, শিগগির যা ইউনিফরম্ পরে নে। খদ্দের আসতে সুরু করেছে।'

বিদ্যাধর রান্নাঘরের ভিতর প্রস্থান করিল।

বহির্দ্বার দিয়া একটি তরুণীর প্রবেশ। সুন্দরী তন্বী, চোখে বিষাদের ছায়া। পায়ে হাই-হীল সোয়েড জুতা, পরিধানে দামী সিল্কের বেগুনী রঙের সাড়ি ও ব্লাউজ। হাতে একগাছি করিয়া সোনার চুড়ী। বাম কব্জীতে একটি গিনির মত পাতলা ক্ষুদ্র ঘড়ি। গলায় প্লাটিনামের সরু হারে একটি হীরার লকেট ঝুলিতেছে। কানে কোন অলঙ্কার নাই। মাথার চুল ঈষৎ রুক্ষ, এলো খোঁপার আকারে জড়ানো।

বেণী: [সহর্ষে হাত ঘষিতে ঘষিতে] আসুন মা লক্ষ্মী আসুন, এই চেয়ারটিতে বসুন।—এখনো ফাগুন মাস শেষ হয় নি, এরি মধ্যে কি রকম গরম পড়ে গেছে দেখছেন? পাখাটা খুলে দেব কি?

তরুণী ক্লান্ত ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন; বেণী পাখা খুলিয়া দিলেন।

বেণী: [হাত ঘষিতে ঘষিতে] তা আপনার জন্য কি ফরমাস দেব বলুন ত? চা? কোকো? না, এ গরমে চা কোকো চলবে না। ঘোলের সরবৎ? চকোলেট ড্রিঙ্ক? আইসক্রীম? যা চাইবেন তাই তৈরী আছে। আমি বলি, এক গেলাস বরফ দেওয়া ঘোলের সরবৎ খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করে নিন, তারপর দুখানা ক্রীম কেক—কিম্বা যদি ইচ্ছা করেন দুটো চিংড়ি মাছের কাটলেট—

তরুণী: চা দিন এক পেয়ালা—

বেণী: চা? যে আজ্ঞে তাই দিচ্ছি। এ সময় চায়ে খুব তেষ্টা নাশ করে বটে! ওরে বিদ্যে, অর্ডার নিয়ে যা—

অদ্ভুত ইউনিফর্ম পরিয়া বিদ্যাধরের প্রবেশ।

নিম্নাঙ্গে চুড়িদার পায়জামা, ঊর্ধ্বাঙ্গে জরীর কাজকরা নীল রঙের ফতুয়া, মাথায় হাঁড়ির মত আকৃতি-বিশিষ্ট এক টুপী। এই ইউনিফর্ম বিদ্যাধরের স্বকল্পিত সৃষ্টি।

তরুণীর সম্মুখবর্তী হইয়াই বিদ্যাধর ভীষণ মুখ বিকৃতি করিতে আরম্ভ করিল।

তরুণী অন্যমনস্ক ভাবে হাতের উপর চিবুক ও টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া বসিয়াছিলেন—কিছু লক্ষ্য করিলেন না।

বেণী: [বিদ্যাধরকে একটা গুপ্ত ঠেলা দিয়া নিম্নস্বরে] ও কি, অমন করে দাঁত মুখ খিঁচুচ্ছিস কেন? অর্ডার নে।

বিদ্যা: [বিকট স্বরে] কি চাই?

তরুণী চমকিয়া উঠিলেন; অবাক হইয়া কিছুক্ষণ বিদ্যাধরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিদ্যাধর পূর্ববৎ মুখভঙ্গী করিতে লাগিল।

তরুণী : [অধর দংশন করিয়া] চা চাই—একটু তাড়াতাড়ি। আমাকে এখনি বারাকপুর রেসে যেতে হবে।

বিদ্যাধর পিছু হটিয়া প্রস্থান করিল।

বেণী : দু'মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে—সব তৈরী আছে। তা শুধু চা কি ঠিক হবে? সেই সঙ্গে দুটো কাটলেট—বিদ্যের হাতের কাটলেট এ অঞ্চলে বিখ্যাত—একবার মুখে দিলে আর ভুলতে পারবেন না।

তরুণী : [ঈষৎ হাসিয়া] আচ্ছা, আনতে বলুন—

বেণী : [নেপথ্যের উদ্দেশে] এক পেয়ালা চা, দুখানা কাটলেট, জলদি। [তরুণীর দিকে ফিরিয়া] মাঠাকরুণ এর আগে কখনো 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' পায়ের ধূলো দেন নি, নইলে আগেই বিদ্যের কাটলেট অর্ডার দিতেন। কলকাতায় যত ভাল ভাল তরুণী আছেন সবাই এখানে পায়ের ধূলো দিয়ে থাকেন। অন্ততঃ হপ্তায় একবার বেণী খুড়োর হোটেলে আসাই চাই। তাঁদেরই দয়ায় বেঁচে আছি।

তরুণী : আমি কলকাতায় থাকি না। কখনো কখনো আসি।

বেণী : রেস খেলতে এসেছেন বুঝি? আজকাল অনেক মেয়েরা বাইরে থেকে আসেন—

তরুণী : না রেস খেলতে নয়, রেসে যাচ্ছিলুম অন্য কাজে,—আপনিই বুঝি এই রেস্তোঁরার মালিক?

বেণী : আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি মালিক বটে তবে বিদ্যেই সব করে; আমি শুধু পয়সা কুড়োই।

তরুণী : আপনার ঐ চাকরটির নাম বিদ্যে? ও কি বাঙালী?

বেণী : বাঙালী বই কি, আসল বাঙালী। কায়েতের ছেলে। কিন্তু ওর নাম বিদ্যে নয়, [গলা খাটো করিয়া] ও মস্ত বড়মানুষ ছিল

—নানান্ ফেরে পড়ে এখন গরিব হয়ে গেছে, তাই হোটেলে চাকরী করছে। ওর বাড়ী বোধ হয়—

চা ও কাটলেটের প্লেট লইয়া বিদ্যাধর প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ প্রচণ্ড ভাবে উপর্যুপরি হাঁচিতে আরম্ভ করিল। বেণী ফিরিয়া দেখিলেন বিদ্যাধর গলা ও মাথার চারিপাশে একটা কম্ফর্টর জড়াইয়া আরো অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

বেণী: [কাছে গিয়া ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত ভাবে] এসব তোর কি হচ্ছে বিদ্যে? গলায় কম্ফর্টার জড়িয়েছিস কেন, অত হাঁচ্ছিস কেন?

বিদ্যা: [বেণীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া] খবরদার খুড়ো, একটি কথা বলেছ কি এক কামড়ে তোমার কানটি কেটে নেব, একেবারে ভুবনের মাসী হয়ে যাবে। যা করছি করতে দাও—কথাটি কোয়োনা।

বেণী বিহ্বল হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিদ্যা চা ও কাটলেট তরুণীর সম্মুখে রাখিল।

বিদ্যা: আমি বিদ্যে, আমার সর্দি হয়েছে—হাঁচ্ছি,—হাঁ—চ্ছি—

তরুণী: সর্বনাশ। আমার চায়ে হেঁচে দাওনি ত?

বিদ্যা: না—না—চায়ে আমি হাঁচি না—হাঁ—চ্ছি—

তরুণী: কিন্তু চা একেবারে তৈরী করে নিয়ে এলে কেন? আমি যে চায়ে চিনি খাই না।

বিদ্যা: খেয়ে দেখুন, চায়ে চিনি নেই—

[হাঁচিতে হাঁচিতে প্রস্থান]

তরুণী এক চুমুক চা পান করিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে বেণীকে ডাকিলেন, বেণী নিকটে আসিলেন!

তরুণী : দেখুন, আপনার এই চাকরটি বোধ হয় পাগল।

বেণী : [মাথা নাড়িয়া] না পাগল ত ছিল না তবে আজ হঠাৎ কেমন ধারা হয়ে গেছে। [গলা খাটো করিয়া] আমার কান কামড়ে নেবে বলে ভয় দেখাচ্ছিল।

তরুণী : সে কি ! তবে ত একেবারে উন্মাদ !

বেণী : না উন্মাদ নয়, এই খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত বেশ সহজ ভাবে কথা কইছিল। ওর কিছু একটা হয়েছে—

তরুণী : যদি উন্মাদ না হয় তা হলে নিশ্চয় অন্তর্যামী, নৈলে আমি চায়ে চিনি খাই না জানলে কি করে ?

বেণী : [চিন্তিতভাবে] সত্যিই ত ! জান্‌লে কি করে ?—বিন্তে, এদিকে আয়—

তরুণী : থাক, ওকে ডাকবার দরকার নেই। ভাল 'ওয়েটার'রা সাধারণতঃ অন্তর্যামী হয়ে থাকে—ওতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। [চা পান করিতে করিতে] আচ্ছা আপনার দোকানে ত অনেক লোক আসে যায়, আমি একজন লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার সন্ধান দিতে পারেন ? তারি খোঁজে আজ রেসকোর্সে যাচ্ছিলুম, সেখানে অনেক লোক যায়, যদি তার দেখা পাই।

বেণী : [সম্মুখের চেয়ারে উপবেশন করিয়া] কি রকম লোক তুমি খুঁজছ মাঠাক্‌রুণ তার বর্ণনাটা একবার দাও ত শুনি। তার নাম ধাম চেহারার একটা আন্দাজ দাও, দেখি যদি বেরিয়ে পড়ে।

তরুণী : নাম জেনে বিশেষ সুবিধে হবে না, কারণ সম্ভবতঃ সে ছদ্মনামে বেড়াচ্ছে। যা হোক, কাজ চালানোর জন্যে ধরে নেওয়া যাক যে তার নাম—রণেন্দ্র সিংহ।

বেণী : কি নাম ? রণেন্দ্র সিংহ ?

তরুণী : মনে করুন রণেন্দ্র সিংহ। কেন, এ ধরণের নাম কি আপনি পূর্বে শুনেছেন নাকি ?

বেণী : হুঁ, শুনেছি বলেই মনে হচ্ছে, তবে লোকটাকে যে চিনি সে কথা এখনো জোর করে বলতে পারছি না। লোকটির আর সব পরিচয় ?

তরুণী : দেখুন, লোকটির পুরো পরিচয় দিতে গেলে একটা গল্প বলতে হয়। আপনার ঐ চাকরটির মত তারো একটু পাগলামীর ছিট আছে।

ইতিমধ্যে বিদ্যাধর হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া তরুণীর চেয়ারের পিছনে বসিয়াছিল এবং একাগ্রমনে কথাবার্তা শুনিতেছিল।

বেণী : বল মা লক্ষ্মী তোমার গল্প, আজ দেখছি আমার রূপকথা শোনবার পালা।

তরুণী : রূপকথা ! হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমার গল্প রূপকথার মতই আশ্চর্য। তবে শুনুন,—একটি গরিবের মেয়ে ছিল। ধরুন তার নাম—মঞ্জুষা—

বেণী : হু ধরেছি, বলে যাও মা লক্ষ্মী—

তরুণী : মঞ্জুষা গরীবের মেয়ে, পরের গলগ্রহ হয়ে অনেক দুঃখ পেয়ে সে মানুষ হয়েছিল। তাই যখন সে বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলে তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনো কারুর গলগ্রহ হবে না ; যদি কোনদিন অনেক টাকা পায় তবেই বিয়ে করবে নচেৎ চিরদিন কুমারী থাকবে। কিন্তু অনেক টাকা পাবার কোনো আশাই তার ছিল না, কারণ, ছোট ছোট মেয়েদের ক খ শিখিয়ে সে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জন করত। তাই চিরদিন মিসি বাবা হয়ে থাকবার সম্ভাবনাই ছিল তার বেশি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক রাজপুত্তুর কোথা থেকে এসে সঙ্গে ভাব করতে আরম্ভ করে দিলে—তার নাম রণেন্দ্র সিংহ। এরই কথা আপনাকে বলেছিলুম। বাইরে থেকে লোকটিকে সহজ মানুষ বলে মনে হয় কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে পাগল। মঞ্জুষার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল, দুজনের রোজই দেখা হ'তে লাগল। তার সম্বন্ধে মঞ্জুষার মনের ভাব কি রকম হয়েছিল তা আমি বলতে পারি না, কিন্তু মনের ভাব যাই হোক, কোন অবস্থাতেই যে সে তার প্রতিজ্ঞা ভুলবে না তাতে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই রণেন্দ্র সিংহ যেদিন তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেদিন সে রাজী হল না। পরদিন রাজপুত্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে কেন সে তাকে বিয়ে করতে পারবে না। চিঠি পেয়ে এই রাজপুত্র এক অদ্ভুত কাজ করলে, নিজের ধনরত্ন রাজ্যপাট সমস্ত মঞ্জুষার নামে দানপত্র করে দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল

বেণী : তারপর ?

তরুণী : তারপর আর কি ? মঞ্জুষা পাগলা রাজপুত্তুরকে দেশ-দেশান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছে—

বেণী : হুঁ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মেয়েটা রাজপুত্তুরের টাকাকড়ি সব নিলে ?

তরুণী : হ্যাঁ নিলে।

বেণী : নিতে তার একটুও বাধ্‌ল না ? হাত পুড়ে গেল না ?

তরুণী : না হাত পুড়ে গেল না। তার অধিকার ছিল বলে সে নিয়েছিল, নইলে নিত না।

বেণী : কি অধিকার ?

তরুণী : (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হেঁট মুখে) বোধ হয় ভালবাসার অধিকার।

বেণী : বুঝলুম না।

তরুণী : [মুখ তুলিয়া] যাঁকে মঞ্জুষা ভালবাসে, যাঁকে মনে মনে স্বামী বলে বরণ করেছে তাঁর সম্পত্তিতে তার অধিকার নেই কি ?

বেণী : (কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া) কিন্তু—কিন্তু—আর একটা কথা, মেয়েটি কি আর একজনকে বিয়ে করেনি ? একটা মাতাল লম্পট বদমায়েসকে—

তরুণী : মিথ্যা কথা। মঞ্জুষা তার কুমারী হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা নিয়ে তার রাজপুত্রকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভগবান তাকে অনেক টাকা দিয়েছেন, সে এখন ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে পারে। কিন্তু সে তার রাজপুত্র ছাড়া আর কাউকে চায় না।

বিষ্ণা : [সহসা সম্মুখে আসিয়া] কিন্তু যে লিক্‌লিকে চেহারা ঘাড়ে-ছাঁটা-চুল সোয়েটার-পরা লোকটাকে মঞ্জুষা দোতলার সামনে দাঁড়িয়ে চুমু খাচ্ছিল, সে লোকটা তবে কে ?

তরুণী : মিথ্যে কথা, মঞ্জুষা আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষকে চুমু খায়নি—

বিষ্ণা : তবে সে কে ?

তরুণী : সে আমার বন্ধু রমলা। আমরা দুজনে এক ইস্কুলে পড়াতুম। রমলার চুল শিঙ্গ্‌ল করা—

বিষ্ণা : অ্যাঁ ! [ললাটে করাঘাত করিয়া] উঃ, মঞ্জু—[তরুণীর হস্তধারণের চেষ্টা করিল]।

তরুণী : [বেণীকে] আপনার চাকর ত ভারি অসভ্য—মেয়ে মানুষের হাত ধরে !

বেণী : [হুঙ্কার করিয়া] বিত্তে, শিগ্‌গির হাত ছেড়ে দে বেয়াদব—

বিত্তা : [কম্ফর্টর ও টুপী খুলিতে খুলিতে] খুড়ো, জলদি ভাগো, রান্নাঘরে গিয়ে ঘোলের সরবৎ খাও গে, নইলে দুটো কানই তোমার কাম্‌ড়ে শেষ করে দেব—কিচ্ছু থাকবে না [খুড়ো পশ্চাৎপদ] মঞ্জু, কখন চিনতে পারলে ?

মঞ্জু : [বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে হাসিয়া] দেখবামাত্রই। মুখবিকৃতি করে কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারো ? জান না, দাঁত খিঁচিয়ে কেউ কেউ নিজে সত্যিকার পরিচয় দিয়ে ফেলে !

রণেন্দ্র : মঞ্জু, বড্ড ভুল করে ফেলেছি—সত্যিই আমি পাগল—

মঞ্জু : কি বলে বিশ্বাস করলে ? এতটুকু আস্থা নেই ? এই ভালবাসা ?

রণেন্দ্র : মঞ্জু, এইবারটি মাপ কর। বল ত খুড়োর টেবিলের ওপর দুশো বার নাকখৎ দিচ্ছি।

মঞ্জু : থাক। একে ত পাগল, তার ওপর যদি নাকটাও ঘষে মুছে যায়, [চুপি চুপি] তাহলে আমি কি নিয়ে ঘর করব ?

রণেন্দ্র : [মঞ্জুকে নিকটে টানিয়া] মঞ্জু, এখনি বলছিলে আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষকে চুমু খাওনি। তা—সে ত্রুটি এইবেলা সংশোধন করে নিলে হত না ?

বেণী : এই খবরদার ! বুড়ো মানুষের সামনে বেয়াদবি করো না, আমাকে আগে রান্নাঘরে যেতে দাও। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] কিন্তু বিত্তে, তুই ত তোর রাজকন্যে নিয়ে আজ নয় কাল চলে যাবি, এ বুড়োর কি দশা হবে ?

রণেন্দ্র : [বেণীর পিঠ চাপড়াইয়া] ভেবোনা খুড়ো, আমিও যে

পথে তুমিও সেই পথে। মঞ্জুর অনেক টাকা, আমাদের দুজনকে অনায়াসে পুষতে পারবে।

বাহিরে বহু মোটর আগমনের শব্দ শোনা গেল।

বেণী: [উঁকি মারিয়া দেখিয়া] ঐ রে! সব ছোঁড়াছুঁড়িগুলো একসঙ্গে এসে পড়েছে। কিছু যে তৈরী নেই—কি হবে বিষ্টে?

রণেন্দ্র: কুছ্‌পরোয়া নেই খুড়ো, আজ আমরা দুজনে কাজ করব,—মঞ্জু তৈরী করবে আমি পরিবেষণ করব। কি বল মঞ্জু—অ্যাঁ! মনে কর এটা তোমার আইবুড়ো ভাতের ভোজ।

মঞ্জু সলজ্জে ঘাড় নাড়িল।

একদল তরুণ-তরুণীর কল-কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ। সকলের উপবেশন ও খাদ্যপানীয়ের ফরমাস দান।

হঠাৎ একজন তরুণ এক হাতে এক গোছা নোট তুলিয়া ধরিয়া আন্দোলিত করিতে করিতে গান ধরিল। আর সকলে, কেহ গলা মিলাইয়া কেহ বা হাতে তাল দিয়া যোগ দিল:—

বেরালের ভাগ্যে ছিঁড়েছে আজ সিকে
—ট্রা—লা—
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো!
ইচ্ছে হচ্ছে নাচি দিক্‌বিদিকে——ট্রা—লা—
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো!
বিষ্টে কোথায়, নিয়ে আয় সরবৎ—
খুড়ো, বসে থেকো না জড়বৎ
ঘোড়দৌড়ে জিতেছি আজ পাঁচ কড়া
পাঁচ সিকে—
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো!

খেয়ে বেদম চিংড়ির কাটলেট
আইস ক্রীমে ভরিয়ে নিয়ে পেট
বিয়ে করবো আজ রাত্তিরেই প্রাণের
প্রেয়সীকে
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো !

১৩৩৯

পিছুডাক

বাংলা দেশের কোনও একটি বড় রেলওয়ে জংশনে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েদের ওয়েটিং রুম। ঘরটি টেবিল চেয়ার গদি-আঁটা চওড়া বেঞ্চি প্রভৃতি যথোচিত আসবাবে সজ্জিত। মেঝে পরিষ্কার মোজেইক করা। ঘরের প্রবেশ দ্বারে সতরঞ্চির মত পর্দা ঝুলিতেছে, পাশে আর একটি দরজার মাথার উপর লেখা—ল্যাভেটারি। রাত্রি কাল; মাথার উপর তীব্রশক্তির দুটা ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বলিতেছে।

প্রবেশ দ্বারের দিকে পিছন করিয়া ঘরের এক পাশে একটি স্ত্রীলোক মেঝেয় সতরঞ্চির উপর বসিয়া পান সাজিতেছে ও মৃদুগুঞ্জনে হিন্দী ঠুংরী ভাঁজিতেছে। সাজপোষাক ধনী শ্রেণীর বাঙ্গালী কুলকন্যার মত, সম্মুখে রূপার পানের বাটা। পিছনে কিছু দূরে কয়েকটা সুটকেশ হোল্‌ডল বেতের ঝাঁপি প্রভৃতি ও একটা রূপার গড়গড়া রহিয়াছে; এগুলি এই স্ত্রীলোকেরই লটবহর, কারণ ঘরে অন্য কোনও যাত্রী নাই।

স্ত্রীলোকের বয়স অনুমান আটাশ বৎসর—তবু রূপের বুঝি অবধি নাই। যৌবন অপরাহ্নের দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সহসা তাহা ধরা যায় না। কী মুখের পরিণত সৌকুমার্যে, কী শরীরের নিটোল বাঁধুনিতে, যৌবন যেন এত রূপ ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না। চোখের দৃষ্টি স্বভাবতই গর্বিত ও প্রভুত্ব-জ্ঞাপক; লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধা গায়িকা কেশর বাঈ যে মুগ্ধা-নায়িকা নয়, বরং অত্যন্ত সচেতনভাবে স্বাধীনভর্তৃকা তাহা তাহার রাণীর মত চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ থাকে না।

পান সাজা প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় দরজার সতরঞ্চি রঙের পর্দা সরাইয়া ওয়েটিং রুমের দাসী প্রবেশ করিল। রোগা ঘাঘ্‌রা পরা স্ত্রীলোক; হাড় বাহির করা গালের ভিতর হইতে পান দোক্তার ডেলা ঠেলিয়া আছে। বাঈজীকে সে প্রথম দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিল। সে অতি নিম্ন শ্রেণীর ও নিম্ন চরিত্রের স্ত্রীলোক; ওয়েটিং রুমের দাসীত্ব করাই তাহার একমাত্র উপজীবিকা নয়। তাই সমধর্মী আর এক নারীর গৌরব গরিমায় সে নিজেও যেন একটা মর্যাদা অনুভব করিতেছিল।

বিগলিত মুখের ভাব লইয়া সে কেশর বাঈয়ের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাসী: বাঈ সাহেবা, আপনি নিজে পান সাজ্‌ছেন! দিন, আমি সেজে দিই।

বাঈজী তাচ্ছিল্যভরে একবার চোখ তুলিল।

কেশর: দরকার নেই। পরের হাতের সাজা পান আমি মুখে দিতে পারিনা।

দাসী মুখ কাঁচুমাচু করিল।

দাসী : তাহলে—তামাক সেজে আনি ?

পানের খিলি মুখের কাছে ধরিয়া কেশর ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিল।

কেশর : না থাক।

পান মুখে দিয়া কেশর বাকি পানগুলি ডিবায় ভরিতে ভরিতে একটা কোনও জিনিষ এদিকে ওদিকে খুঁজিতে লাগিল। ওদিকে দাসী যাইতে চায়না, বাঈজীর জন্য একটা কিছু করিতে পারিলে সে কৃতার্থ হয়।

দাসী : বাঈ সাহেবার রাত্রের খানা-পিনাও তো এখন হয়নি। গাড়ী আসবে সেই পৌনে দশটায়—এখনও অনেক দেরী। যদি হুকুম হয় তো কেল্‌নারে ফরমাস দিয়ে আসি—

কেশর : খাবার পাট আমি চুকিয়ে নিয়েছি। ম্যানেজার সাহেব বাইরে আছেন ? তুই একবার তাঁকে ডেকে দে।

দাসী : এই যে বিবি সাহেবা, এক্ষুনি দিচ্ছি। তিনি প্লাটফরমে পায়চারি করছেন।

দাসী ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল। কেশর দুটি পান হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। পানের সহিত যে বিশেষ মশ্‌লাটিতে সে অভ্যস্ত ঠিক মৌতাতের সময় তাহা হাতের কাছে না পাইয়া বাঈজী একটু অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

পর্দা ঠেলিয়া যে লোকটি ঘরে প্রবেশ করিল তাহার নাম বিজয়। সে যে এককালে বিত্তবান ও ভদ্রশ্রেণীর লোক ছিল তাহার চেহারা দেখিয়া এখনও অনুমান করা যায়; ধানের শীষ পাটে আছ্‌ড়াইলে শস্য ঝরিয়া গিয়া কেবল খড়ের গোছাটা যেমন দেখিতে হয়, অনেকটা সেইরূপ। শীর্ণ লম্বা লোক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; মাথার সম্মুখস্থ টাকের নগ্নতা ঢাকা দিবার জন্য পাশের লম্বা চুল টানিয়া

আনিয়া টাকের লজ্জা নিবারণ করা হইয়াছে। এই লোকটির চেহারা হাসি কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যেই একটু শুষ্কতা আছে। গত দশ বৎসরে নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু ও পূর্বপুরুষ সঞ্চিত সমস্ত অর্থ নিঃশেষে কেশর বাঈজীর পায়ে ঢালিয়া দিয়া এখন নিজেকেও সে বাঈজীর পদমূলে নিক্ষেপ করিয়াছে। নামে সে বাঈজীর বিজ্‌নেস ম্যানেজার; আসলে গলগ্রহ। বাইজীর মনে বোধহয় দয়া-মায়া আছে, তাই সে বিজয়কে তাড়াইয়া না দিয়া অন্নদাস করিয়া রাখিয়াছে। বিজয় সে কথা বোঝে; তাই তাহার নিরুদ্ধ অভিমান নিজের চারিপাশে শুষ্কতা ও নীরস ব্যঙ্গ বিদ্রূপের একটা আবরণ ফেলিয়া রাখিয়াছে।

কেশরের দিকে আসিতে আসিতে বিজয়ের অধরের একপ্রান্ত গোপন ব্যঙ্গভরে নত হইয়া পড়িল।

বিজয়ঃ কি বাঈজী, খুঁজি খুঁজি নারি? অমূল্য নিধি খুঁজে পাচ্ছ না?

কেশর ঈষৎ বিরক্তি ভরে চোখ তুলিল।

কেশরঃ তুমিই পানের বাটা থেকে কখন সরিয়েছ। দাও কৌটো।

বিজয় কাত করা একটা স্যুটকেসের প্রান্তে বসিল।

বিজয়ঃ নেশা নেশা নেশা। দুনিয়ার এমন লোক দেখলুম না যার একটা নেশা নেই; সবাই নেশার ঝোঁকে চলেছে। মৌতাতের সময় নেশার জিনিবটি না পেলে বড় কষ্ট হয়, না কেশর বাঈ?

কেশরঃ হয়। এখন কৌটো দাও।

বিজয় ধীরে-সুস্থে পকেট হইতে একটি দেশালাই বাক্সের আকৃতির রূপার কৌটা বাহির করিল; সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে কতকটা যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিল—

বিজয়ঃ নেশা ভাল—তাতে মৌজ আছে। কিন্তু নেশা যখন ভূতের মতন ঘাড়ে চেপে বসে তখনই বিপদ। দেখো বাইজী, নেশার পাল্লায় পড়ে যেন আমার মতন সর্বস্বান্ত হয়ো না। আমার দৃষ্টান্ত দেখে সামলে যাও।

কেশর ভ্রূ তুলিয়া চাহিল।

কেশরঃ তুমি কি নেশার পাল্লায় প'ড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে ?

বিজয়ঃ তা ছাড়া আর কি ? ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, নেশা রয়ে গেছে, কিন্তু মৌতাত আর পাওয়া যাচ্ছে না।

কেশরঃ তোমার মৌতাত তো মদ।

বিজয়ঃ মদ ? উঁহু। মদ খাই বটে—না খেলে চলেও না—কিন্তু ওটা আমার আসল নেশা নয়। আমার আসল নেশা—

বিজয় অর্থপূর্ণভাবে কেশরের মুখের পানে চাহিয়া হাসিল ; তারপর যেন কথা পাল্টাইয়া বলিল—

বিজয়ঃ মদের পয়সা না থাকলে মানুষ যেমন তাড়ি খায়, আমার মদ খাওয়া তেমনি—

ইঙ্গিতটা বুঝিতে কেশরের বাকি রহিল না কিন্তু সে অবহেলাভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—

কেশরঃ আবোল-তাবোল বোকো না ; কেল্‌নারে ঢুকেছিলে বুঝি ?

বিজয়ঃ (হাসিয়া) আরে, সেখানে ঢোকবার কি জো আছে—ট্যাঁক্ যে একেবারে ফাঁক ! তাই ভাবছিলুম তুমি যদি—আজ শীতটাও পড়েছে চেপে—

কেশরঃ (দৃঢ় স্বরে) না। এখনও ট্রেনে অনেকখানি যেতে হবে। ঘরে মদ খেয়ে যা কর তা কর, বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ে থাক,

আমি কিছু বলিনে। কিন্তু রাস্তায় ওসব চলবে না। যাও এখন এটা মেয়েদের ওয়েটিং রুম, এখানে বেশীক্ষণ থাকলে হয় তো ষ্টেশন-মাষ্টার হাঙ্গামা করবে। বাইরে গিয়ে বসো গে—

বিজয়ঃ (উঠিয়া) তথাস্তু। আজ নিরামিষই চলুক তাহলে। কিন্তু শাদা চোখে এই ষ্টেশনে একলা বসে ধর্‌ণা দেওয়া—বড়ই একঘেয়ে ঠেকবে বাঈজী—

বিজয় বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

কেশরঃ কৌটোটা দিয়ে যাও।

বিজয় হাসিয়া ফিরিয়া চাহিল।

বিজয়ঃ সেটা কি ভাল দেখাবে বাইজী? ব্রত-উপবাস যদি করতেই হয় তবে দুজনে মিলেই করা যাক। তুমি কালিয়া পোলাও খাবে আর আমি দাঁত ছির্‌কুটে পড়ে থাকব, সেটা কি উচিত? তুমিই ভেবে দ্যাখো!

কেশর কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বিজয়ের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর নিঃশব্দে একটা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

বিজয়ঃ ধন্যবাদ। দয়ার শরীর তোমার বাইজী। এই নাও কৌটো।

দ্রুত হস্তে কৌটা লইয়া কেশর প্রথমে দুটা পান মুখে পুরিল, তারপর কৌটা হইতে এক চিমটি মশ্‌লা লইয়া গালে ফেলিল। বিজয় দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—

বিজয়ঃ কেশর বাঈ তুমি লক্ষ্ণৌয়ের নামজাদা বাঈজী, রূপে-গুণে, টাকায়-বুদ্ধিতে, ঠাটে-ঠমকে তোমার জোড়া নেই—তোমাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমার সাজে না। কিন্তু তবু বলছি, ও জিনিষটা একটু সাবধানে খেও। বিশ্রী জিনিষ। একবার একটু মাত্রা

বেশী হয়ে গেলে—এমন যে ভুবনমোহিনী তুমি, তোমাকেও আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

প্রথম চিম্‌টি মুখে দিবার সঙ্গে সঙ্গে কেশরের ঔষধ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চোখে মুখে একটা উত্তেজনা-দীপ্ত প্রফুল্লতা দেখা দিয়াছিল; সে আর এক টিপ মশ্‌লা মুখে দিতে দিতে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—

কেশর: আমার মাত্রা বেশী হবে না। তুমি এখন এস্ গিয়ে।

বিজয়ের মুখে কিন্তু চকিত উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছিল, সে এক-পা কাছে আসিয়া বলিয়া উঠিল—

বিজয়: মণি! আর খেও না! সত্যি বলছি, ওটা বড় সাংঘাতিক জিনিষ! মণি—!

নিজের পুরাতন নামে সহসা আহূত হইয়া কেশরের নেশা-জনিত প্রসন্নতা মুখ হইতে মুছিয়া গেল; চমকিয়া সে বিজয়ের পানে বিস্ফারিত চক্ষু ফিরাইল।

কেশর: চুপ! ও নাম আবার কেন?

কেশর কট্ করিয়া মশ্‌লার কৌটা বন্ধ করিল। বিজয় হাসিল; তাহার কণ্ঠের স্বাভাবিক ব্যঙ্গ-ধ্বনি আবার ফিরিয়া আসিল।

বিজয়: মাফ্ কর বাঈজী, বে-টক্করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দশ বছরের অভ্যেস, যাবে কোথায়? প্রথম যখন ঘর ছেড়ে আমার সঙ্গে বেরিয়েছিলে, তখনি 'মণি'ই ছিলে; আরও ক'বছর—যদ্দিন আমার টাকা ছিল—ঐ নামই জারি রইল। তারপর হঠাৎ একদিন তুমি মনমোহিনী কেশর বাঈ হয়ে উঠলে। ছিলাম তোমার মালিক, হয়ে পড়লাম—ম্যানেজার। কিন্তু মনের মধ্যে সেই পুরানো নামটি গাঁথা রয়ে গেছে। মণি মণি মণি! কি মিষ্টি কথাটি বল দেখি? সহজে কি ভোলা যায়?

শুনিতে শুনিতে কেশরের মুখ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, সে রুক্ষ স্বরে বলিল—

কেশর : আমার ভাল লাগে না। যা চুকে-বুকে গেছে তার জন্য আমার মায়াও নেই, দরদও নেই। ওসব আগের জন্মের কথা। আমি কেশর বাঈ—এ ছাড়া আমার অন্য পরিচয় নেই। আর কখনও ও-নামে আমাকে ডেকোনা।

বিজয় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, তারপর অলস পদে দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

বিজয় : এখনও তোমার ঘা শুকোয়নি বাঈজী।

বিজয় বাহির হইয়া গেল। কেশর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর কতক নিজমনেই বলিল—

কেশর : ঘা শুকোয় নি! না মিছে কথা। আমার কোনও আপ্‌শোষ নেই। কিন্তু—কিন্তু—যখনই ঐ নামটা শুনি—মনে হয় কে যেন পিছন থেকে ডাক্‌ছে। পিছু ডাক!

কেশর মাথা নাড়িয়া চিন্তাটাকে যেন দূরে সরাইয়া দিল, তারপর অন্যমনস্কভাবে কৌটা খুলিয়া এক টিপ্‌ মশলা মুখে দিবার উপক্রম করিল।

মুখে দিতে গিয়া তাহার চমক ভাঙিল। সে মশালার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া আবার উহা কৌটায় রাখিয়া দিল। তারপর কৌটাটা পানের বাটার মধ্যে রাখিয়া দৃঢ়ভাবে বাটা বন্ধ করিল।

কেশর : উহুঁ, আর না। বেশী হয়ে যাবে।

ওয়েটিং রুমের বাহিরে প্ল্যাটফর্মে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, পরক্ষণেই একটা ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল। ইঞ্জিনের চোঁ চোঁ হড়্‌হড়্‌ শব্দ,

যাত্রীদের ওঠা নামার হুড়াহুড়ি,—'কুলী—কুলী'—'চা—গরম' —'হিন্দু পানি'—'কাবাব রোটি'—ইত্যাদি।

গোটা দুই কুলী কয়েকটা লটবহর লইয়া ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিল এবং মোটগুলি ঘরের অন্য পাশে রাখিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। ইত্যবসরে নবাগত মেল ট্রেনটিও বংশী ধ্বনি করিয়া হুস্ হুস্ শব্দে বাহির হইয়া পড়িল।

এই সময় একটি পুরুষ গলা বাড়াইয়া ওয়েটিং রুমে উঁকি মারিলেন গায়ে ওভারকোট, মাথা ও মুখ বেড়িয়া পাঁশুটে রঙের একটি কম্ফর্টর—সম্ভবত সর্দি হইয়াছে। তিনি ঘরের ভিতরটা এক-নজর দেখিয়া লইয়া, বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া সর্দি-চাপা গলায় ডাকিলেন—

পুরুষ : ওগো—! এই যে—এদিকে—

বাইশ-তেইশ বছরের একটি সুশ্রী যুবতী বছর-দুয়েকের ছেলে কোলে লইয়া প্রবেশ করিলেন; দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দিতেই সে হাঁটিয়া ভিতরের দিকে চলিল। কেশর দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া ছিল; দ্বারের নিকট গলার আওয়াজ পাইয়া সে কেবল মাথার উপর আঁচলটা টানিয়া দিল।

পুরুষ : তুমি তাহলে খোকাকে নিয়ে এখানেই থাক, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন এসে পড়বে। কাগজ-টাগজ কিছু কিনে এনে দেব? এখনও ষ্টল খোলা আছে।

যুবতী : দরকার নেই। তোমার ছেলে সামলাতেই আমার আধ ঘণ্টা কেটে যাবে। এত রাত্তির হল, এখনও ওর চক্ষে ঘুম নেই।

পুরুষ : তাহলে না হয় ওকে আমিই নিয়ে যাই—আমার কাছে খেলা করবে।

যুবতী : না না, আমার কাছে থাক। খায় নি এখনও। তুমি যাও, আর ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকোনা—

পুরুষ : আমি ভাবছিলুম এইখানেতেই দোরের বাইরে চেয়ার নিয়ে বসে থাকি। যদি তোমার কিছু দরকার টরকার হয়—

যুবতী : কিছু দরকার হবে না আমার। সর্দিতে মুখ তম্‌তম্‌ করছে, বাইরে ঠাণ্ডায় বসে থাকবেন! যাও, ওয়েটিংরুমে দোর বন্ধ করে বোসো গে। (পুরুষ যাইবার উপক্রম করিলেন) আর শোনো! —আমি বলি কি, কেল্‌নার থেকে একটু ব্রাণ্ডি আর কুইনিনের দুটো গুলি আনিয়ে নিয়ে খেও; এই সর্দির ওপর ট্রেনের ঠাণ্ডা—কি জানি বাপু আমার ভয় করছে—যদি আবার জ্বর-টর—

পুরুষ একটু ঠাট্টা করিলেন।

পুরুষ : ডাক্তারের বোন কিনা, একটু ছুতো পেলেই ডাক্তারি করা চাই। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে। কুইনিন গেলা শক্ত হবে না —বাঙালীর ছেলে অভ্যেস আছে—কিন্তু রমা, অন্য জিনিষটা যে গলা দিয়ে নামে না।

রমা : নামবে। লক্ষ্মীটি খেও; ওষুধ বৈত নয়, ঢক্‌ করে গিলে ফেলবে। যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকোনা—

পুরুষ : বেশ। এর পরে কিন্তু মাতাল বলতে পাবে না, তা বলে দিলুম—

রমা : হয়েছে, আর রসিকতা করতে হবে না। যত বুড়ো হচ্ছেন— (কপট ভ্রূকুটি করিল)

পুরুষ : ঘৃতভাণ্ড!—আচ্ছা—ট্রেনের সিগনাল দিলেই আমি আসব।

পুরুষ হাসি এবং কাশি একসঙ্গে চাপিতে চাপিতে প্রস্থান করিলেন।

রমা ঘরের দিকে ফিরিয়া এক পা আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। খোকা ইতিমধ্যে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া হঠাৎ কেশরের পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই ক্ষুদ্র হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া খল্‌খল্‌ হাস্য করিতেছে।

রমা : ওমা ! ওরে ও দস্যি !

রমা তাড়াতাড়ি ছেলেকে কেশরের পৃষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া লইল।

রমা : কিছু মনে করবেন না, ভারী দুরন্ত ছেলে—

কেশর সহাস্যে মাথার কাপড় সরাইয়া রমার পানে চাহিল। তাহার রূপ দেখিয়া রমার চোখ যেন ঝলসিয়া গেল ; সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল।

কেশর : তাতে কী হয়েছে ! এস খোকাবাবু, আমার কোলে এস।

খোকা তিলমাত্র দ্বিধা না করিয়া বুট-সুদ্ধ কেশরের কোলে উঠিয়া বসিল। রমা বিপন্ন হইয়া পড়িল।

রমা : ঐ দেখুন ! আপনার কাপড় নষ্ট করে দেবে !

কেশর : না না, কিছু করবে না। ভারী সপ্রতিভ ছেলে তো ! আর, মুখখানি কি সুন্দর, যেন গোলাপ ফুল ফুটে আছে। তোমার নাম কি খোকাবাবু ?

খোকা মাতার প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিল।

খোকা : মা বলে—দচ্চি।

কেশর হাসিয়া উঠিল।

কেশর : ও মা—দস্যি বলে ! ভারি দুষ্টু তো তোমার মা ! আচ্ছা এবার সত্যিকার ভাল নাম কি তোমার বল তো বাবা ?

খোকা একটি তর্জনী তুলিয়া সমুচিত গাম্ভীর্যের সহিত বলিল—

খোকা : পিটিং কুঃ !

কেশর স্মিত সপ্রশ্ন নেত্রে রমার পানে চাহিল ; রমা হাসিল।

রমা : ওর নাম প্রীতিকুমার—প্রীতিকুমার গুহ। ভাল করে' বলতে পারে না—ঐ কথা বলে।

ক্ষণেকের জন্য কেশর একটু বিমনা হইল।

কেশর : প্রীতিকুমার—গুহ ! (সামলাইয়া লইয়া) বা খাসা নাম—যেমন মিষ্টি খোকা, তেমনি মিষ্টি নাম—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না। এই সতরঞ্চিতেই বসুন। আসুন—

কেশর সতরঞ্চির উপর নড়িয়া বসিল। রমা একবার একটু ইতস্ততঃ করিল।

রমা : এই যে বসি। খোকা এখনও খায়নি, ওর খাবার নিয়ে বসি।

একটা বেতের বাক্স হইতে দুধের বোতল ও কয়েকটা বিস্কুট লইয়া রমা কেশরের কাছে আসিয়া বসিল।

রমা : আয় খোকা, দুধ খাবি—

খোকা দ্বিধা ভরে মাথা নাড়িল।

খোকা : ডুডু কাব না—বিক্কু কাব

রমা : আগে দুধ খাবি, তবে বিস্কুট দেব। আয়।

খোকাকে নিজের কোলে শোয়াইয়া বোতলের স্তনবৃন্ত তাহার মুখে দিতেই খোকা আর আপত্তি না করিয়া দুধ খাইতে লাগিল।

এই দুধ খাওয়ানোর ব্যাপার দেখিতে দেখিতে কেশরের মুখখানা যেন কেমন একরকম হইয়া গেল ; প্রবল আকাঙ্খার সহিত ঈর্ষার মত একটা জ্বালা মিশিয়া তাহার বুকের ভিতরটা আনচান করিতে লাগিল। খোকা পরম আরামে দুধ টানিতেছে ; রমা স্মিতমুখ তুলিয়া কেশরের

পানে চাহিল। কেশর চকিতে মুখে একটা হাসি টানিয়া আনিয়া সহৃদয়তার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিল।

কেশর: আপনারা কোন দিকে যাচ্ছেন?

রমা: আমরা দেবীপুরে যাচ্ছি। ব্রাঞ্চ লাইনে যেতে হয়, রাত্রি একটার সময় পৌঁছুব।—আর আপনি?

কেশর একটু থতমত হইয়া গেল।

কেশর: আমি—আমিও দেবীপুর যাচ্ছি।

রমা: (সাগ্রহে) দেবীপুরে! কাদের বাড়ী যাচ্ছেন?—আপনি কি ওখানেই থাকেন?

কেশরের মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল।

কেশর: না, আমি—একটা কাজে যাচ্ছি।

রমা: ও—তাই। দেবীপুরে আপনার মত এত সুন্দর কেউ থাকলে আমি জানতে পারতুম। আমি দেবীপুরেরই মেয়ে। অবশ্য সকলকে চিনিনা, সহর তো ছোট নয়; কিন্তু—(হাসিয়া) আপনি থাকলে নিশ্চয় চিনতুম।

রূপের প্রশংসায় কেশরের কোনও দিন অরুচি হয় নাই কিন্তু আজ সে তাড়াতাড়ি কথা পাল্টাইয়া ফেলিল।

কেশর: আপনি বাপের বাড়ী যাচ্ছেন?

রমা: হ্যাঁ। সেও কাজে পড়েই যাওয়া। দাদার প্রথম কাজ—মেয়ের বিয়ে। খুব ঘটা করেই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন; খবর পেয়েছি লক্ষ্ণৌ থেকে বাইউলি আসবে। আমার দাদা দেবীপুরের খুব বড় ডাক্তার।

হঠাৎ কেশর পানের বাটার উপর ঝুঁকিয়া পান বাহির করিতে লাগিল। এই মেয়েটি যে-বাড়ীতে যাইতেছে ভ্রাতার নিমন্ত্রণ রক্ষা

করিতে, সেই বাড়ীতেই কেশর যাইতেছে নাচ গানের যোগান দিতে। এতক্ষণ সে রমার সহিত কথা কহিতেছিল সমকক্ষের মত, এমন কি মনের মধ্যে একটু সদয় মুরুব্বিয়ানার ভাবও ছিল; কিন্তু এখন তাহার মনে হইল সে এই মেয়েটার কাছে একেবারে ছোট হইয়া গেছে। কেশর জোর করিয়া মুখ তুলিল, জোর করিয়াই নিজের সহজ গর্বকে উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা করিল। কয়েকটা পান হাতে লইয়া সে অনুগ্রহের কণ্ঠে বলিল—

কেশর: পান খাবেন?—এই নিন্।

যে অনুগ্রহ পাইয়া রাজা-রাজড়া, নবাব-তালুকদার কৃতার্থ হইয়া যায় রমা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, হাসিয়া মাথা নাড়িল।

রমা: আমি পান খাইনা—মানত আছে।

ইতিমধ্যে খোকা দুগ্ধপান শেষ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল; তাহার হাতে বিস্কুট দিতেই সে দু'হাতে দুটি বিস্কুট লইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেশর রমাকে আর দ্বিতীয় বার পান খাইবার অনুরোধ করিল না, ভ্রূ তুলিয়া মুখের একটু বিকৃত ভঙ্গি করিয়া নিজে পান মুখে দিল। তাহার মন যে ভিতরে ভিতরে রমার প্রতি অকারণেই বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেও সে তাহা দমন করিবার চেষ্টা করিল না।

কেশর: যিনি দোর গোড়ায় তোমার সঙ্গে কথা কইছিলেন উনি বুঝি তোমার কর্তা?

রমা হাসিয়া মাথা নীচু করিল।

কেশর: ঠিক আন্দাজ করেছি তাহলে। কথা শুনেই বোঝা যায়—কী দরদ, কী আত্তি—! কতদিন বিয়ে হয়েছে ভাই?

রমা: এই—পাঁচ বছর।

কেশর : পাঁচ বছর! বল কি? এখনও এত! পুরুষের আদর তো অ্যাদ্দিন থাকে না—তবে বুঝি তুমি দ্বিতীয় পক্ষ ভাই? শুনেছি দ্বিতীয় পক্ষের আদর ট্যাঁক্-সই হয়। কেমন, ধরেছি কিনা?

রমার মুখ একটু গম্ভীর হইল; সে খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—

রমা : হ্যাঁ—ঠিক ধরেছেন।

কেশর : (হাসিয়া) তা—দুঃখু কি ভাই। করকরে নতুন টাকা কি সবাই পায়? হাজার হাত ঘুরে এলেও টাকার দাম ষোল আনা। সতীন কাঁটা আছে নাকি?

রমা : না।

কেশর : ভাল ভাল। কাঁটা নেই, কেবল ফুল—এমন দ্বিতীয় পক্ষ হয়ে সুখ আছে। যাই বল।

কেশরের কথার মধ্যে যে ইচ্ছাকৃত খোঁচা আছে তাহা বুঝিতে না পারিলেও রমা মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়াছিল; কিন্তু হাসি-মুখেই বলিল—

রমা : আমার সব খবরই ত নিলেন; আমি কিন্তু আপনার কোনও পরিচয় পেলুম না—

কেশর : আমার পরিচয়—?

কেশরের চোখের দৃষ্টি কড়া হইয়া উঠিল। ক্ষণেকের জন্য মিথ্যা পরিচয় দিবার কথাও তাহার মনে আসিল কিন্তু সে সগর্বে তাহা মন হইতে সরাইয়া দিয়া ব্যঙ্গভরে হাসিয়া উঠিল।

কেশর : আমার পরিচয় শুনবে? দেখো ভাই, শিউরে উঠ্‌বে না তো? তুমি আবার কুলের কুলবধূ—

রমা অবাক হইয়া রহিল। কেশর আর একটা পান মুখে দিয়া

চিবাইতে চিবাইতে সম্মুখে উর্ধ্ব দিকে তাকাইল; তারপর যেন তাচ্ছিল্যভরেই বলিল—

কেশর: কেশর বাঈয়ের নাম শুনেছ? লক্ষ্ণৌয়ের কেশর বাঈ?

রমা ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

রমা: (ক্ষীণ কণ্ঠে) কেশর বাঈজী! আপনিই—!

কেশর: আমিই বিশ্বাস হচ্চে না?

রমা একবার বিহ্বল-নেত্রে চারিদিকে তাকাইল; রূপার গড়গড়াটা চোখে পড়িল। তারপর সে অনুভব করিল, সে বাঈজীর সহিত একাসনে বসিয়া আছে; তাহার সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে হঠাৎ উঠিয়া যাইতেও পারিল না; তাহার বসার ভঙ্গীটা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল মাত্র।

রমা: তাহলে আপনি—দাদার বাড়ীতে—

কেশর রমার ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, তীক্ষ্ণ হাসিয়া বলিল—

কেশর: হ্যাঁ। গান গাইতে যাচ্চি। ভারী লজ্জার কথা—না?

রমা:—না না, তা বলিনি—

রমা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, খোকা বিস্কুট খাইতে খাইতে বিস্কুটের অধিকাংশই দুই গালে মাখিয়া ফেলিয়াছিল, এই ছুতা পাইয়া রমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

রমা: ওরে দস্যি ছেলে, ও কি করেছিস—মুখময় বিস্কুট মেখে বসে আছিস্। পারিনে আমি। চল্, গোসলখানায় মুখ ধুইয়ে দিইগে—

সে খোকার নড়া ধরিয়া গোসলখানার দিকে লইয়া চলিল। কিন্তু তাহার এই চাতুরী কেশরের কাছে গোপন রহিল না; কেশর বিদ্রূপ ভরা স্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—

কেশর: বলেছিলুম, শিউরে উঠবে। ঘরের বৌ—সতীলক্ষ্মী—শিউরে ওঠাই তো চাই, নইলে লোকে বলবে কি! আর, একজন বাঈজীর সঙ্গে এক সতরঞ্চিতে বসা—সে যে মহাপাতক। কি দুঃখু যে কাছেই গঙ্গা নেই, নইলে স্নান করে শুদ্ধ্ হতে পারতে!

রমা: অমি—সেজন্য নয়, খোকাকে—

কেশর: (কঠিন স্বরে) বলতে হবেনা আমি বুঝতে পেরেছি, শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়! কিন্তু তুমি মনে কোরো না যে তোমার মর্যাদা আমার চেয়ে একচুল বেশী—বরং ঢের কম। কে তোমাকে চেনে? তোমার মত বৌ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে আছে—কিন্তু খুঁজে বার কর দেখি আর একটা কেশর বাঈ! তুমি যাচ্ছ বড়-মানুষ ভায়ের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে, আর তোমার ভাই এক দিনের জন্য এক হাজার টাকা দিয়ে খোসামোদ করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। কার মর্যাদা বেশী!

এই গায়ে-পড়া বচসায় রমা ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া কেশরকে লক্ষ্য করিতেছিল, শান্ত স্বরে বলিল—

রমা: আপনার মর্যাদা যদি বেশীই হয়—তা বেশ তো, মান-মর্যাদার কথা তো আমি তুলিনি।

কেশর: মুখে তোল নি কিন্তু ঠারে ঠোরে তাই তো বলছ! কিসের এত দেমাক তোমাদের? ঘরের কোণে স্বামীর লাথি ঝাঁটা খেয়ে তো জীবন কাটাও। তোমাদের আবার মান-মর্যাদা! হ্যাঁ, সে কথা আমি বল্‌তে পারি, মান-মর্যাদা খাতির সম্মান নিজের জোরে আদায় করেছি। কারুর দাসীবৃত্তি করি না—পুরুষ আমাকে মাথায় করে রেখেছে। এত খাতির এত সম্ভ্রম কখনও চোখে দেখেছ তোমরা?

কথা কহিলেই হয় তো ঝগড়ায় দাঁড়াইবে, তাই রমা আর কথা না বলিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

উত্তেজনায় কেশর ফুলিতেছিল, রমা চলিয়া যাইবার পর সে ক্রমশঃ একটু শান্ত হইল, তারপর কৌটা হইতে খানিকটা মশলা লইয়া মুখে দিল।

এই সময় একটি মাতাল দরজার পর্দার ভিতর মুণ্ড প্রবেশ করাইয়া কেশরকে দেখিয়া মহা আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। লোকটির বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; গৌরবর্ণ দোহারা, মুখে একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফ ও মাথায় চুনট্-করা শাদা টুপী। বড় বড় চক্ষু দুটি অরুণাভ।

মাতাল: বন্দেগি বিবি সাহেবা। এক হাজার কুর্ণিশ! (নত হইয়া কুর্ণিশ করিল ও সেই সঙ্গে কেশরের মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল) নাঃ—যা রটে তা বটে! রূপ তো নয়, যেন গন্‌গনে আগুন। অ্যাদ্দিন কানে শুনেই মজে ছিলুম, এখন চোখে দেখে বুক ঠাণ্ডা হল।

কেশর: (রুক্ষস্বরে) কে আপনি?

মাতাল: আমি—, কুলুজী গাইতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে বিবিজান, তার দরকার নেই। তবে কেও-কেটা মনে কোরো না। এখানকারই একজন জমিদার। অবস্থা আগের মত আর নেই বটে, কিন্তু—শরীফ্ আদ্‌মি। রাম তেলক সিংকে এদিকের জজ-ম্যাজিষ্টর সবাই চেনে। একটু গান বাজনা আমোদ-আহ্লাদের সখ আছে; কতবার ভেবেছি তোমাকে আনিয়ে দু রাত্তির মুজ্‌রো শুনি। কিন্তু যা তোমার খাঁই, পেরে উঠিনি গুলবদন। আজ কেল্‌নারে দু' পেগ্ টান্‌তে এসেছিলুম, শুনলুম এই আস্তাকুঁড়ে তোমার পায়ের ধুলো

পড়েছে। ব্যস্, চলে এলুম ; আর কিছু না হোক, দেবী দর্শনটা তো হয়ে যাক।

কেশর : আপনি এখন যান ; এটা মেয়েদের ওয়েটিং রুম।

মাতাল : ঢচনি করেই কি বুকে ছুরি মারতে হয় বাঈজী ! এই এলুম এই চলে যাব ? (মেঝেয় উপবেশন করিল) বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি ভদ্রলোক ? ভাবছ, কোতো কাপ্তেন—দুদণ্ড এয়ার্কি মেরে কেটে পড়ব ! (পকেট হইতে কয়েকটা নোট বাহির করিল) এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ। এই দ্যাখো এখনও পঞ্চাশ টাকা পকেটে আছে। একটি ছোট্ট গজল শুনিয়ে দাও, বুলবুল বাঈ, পঞ্চাশটি টাকা পেন্নামি দিয়ে তস্ হয়ে বাড়ি চলে যাই।

কেশর : আপনি যদি এই দণ্ডে বেরিয়ে না যান, আমি ষ্টেশন মাষ্টারকে ডেকে পাঠাব।

মাতালের মুখের গদগদ ভাব মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল, সে কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মাতাল : ষ্টেশন মাষ্টারের বাবারও ক্ষমতা নেই আমার মুখের ওপর কথা বলে, জুতিয়ে খাল্ খিঁচে নেব। রাম-তেলক সিংকে এদিকের সবাই চেনে ; যতক্ষণ ভদ্দর লোক আছি ততক্ষণ ভদ্দর লোক, কিন্তু বিগড়ে গেলে বাপের কুপুত্তুর। (রক্তনেত্রে চাহিয়া) নাও, আর দেরী কোরো না, ঝাঁ করে একটা গেয়ে ফ্যালো—

কেশর : আমি গাইব না। আপনি যান।

মাতাল : (নিজের উরুতে চাপড় মারিয়া) গাইবে না কি, আলবৎ গাইবে ! পয়সা দিচ্ছি—গাইবে না ! ব্যবসাদার মেয়েমানুষ তুমি, যখন হুকুম করেছি, গাইতে হবে।

অসহায় ক্রোধে ও আশঙ্কায় কেশরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে

কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। এই সময় গোসলখানার দরজা খুলিয়া খোকা কোলে রমা বাহির হইয়া আসিল।

একজন পুরুষকে ঘরের মধ্যে কেশরের অতি নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রমা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল. আঁচলটা মাথার উপর টানিয়া দিয়া তীক্ষ্ণ অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—

রমা : এ কি ! এ ঘরে পুরুষমানুষ কেন ?

মাতাল রমাকে দেখিয়া ক্ষণকাল বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল, তারপর ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাতাল : অ্যাঁ ! এ যে—এ যে—! (হাতযোড় করিয়া) মাফ্ কর্‌বেন মা লক্ষ্মী—আমি জানতুম না—ভেবেছিলুম কেবল বাঈজীই ঘরে আছে। মাফ করবেন, আমি যাচ্ছি। (যাইতে যাইতে ঘুরিয়া) আমি ভদ্দর লোকের ছেলে, ঘরে ভদ্রমহিলা আছেন জানলে এ বেয়াদবি আমার দ্বারা হত না। আমি যাচ্ছি।

লজ্জিত মাতাল চলিয়া গেল। রমা খোকাকে ছাড়িয়া দিয়া একটা চেয়ারে বসিল। মর্যাদায় কে বড়, একটা মাতাল এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছে ; কেশর আর মুখ তুলিয়া রমার পানে চাহিতে পারিল না। রমার মুখ দেখিয়াও তাহার মনের ভাব বোঝা গেল না, কিন্তু কেশরের অহঙ্কার যে ধিক্কার ও অপমানে মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

ইহাদের মধ্যে আবার আলাপ আরম্ভ হইবার আর কোনও সূত্রই ছিল না। দুইজন বিভিন্ন জগতের অধিবাসীর মধ্যে ক্ষণিকের সংস্পর্শে ঘটিয়াছে। রমা গায়ে পড়িয়া এই পতিতার সহিত আবার আলাপ আরম্ভ করিবে তাহার এমন প্রবৃত্তি নাই। কেশরের বলিবার কিছু নাই। সুতরাং বাকি সময়টা হয় তো ইহাদের নীরবেই কাটিয়া

যাইত; কিন্তু যিনি লজ্জা ধিক্কার শুচিতা অশুচিতার অতীত, সেই শিশু ভোলানাথ গোল বাধাইলেন। খোকা স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ নির্বিকার চিত্তে কেশরের কোলে গিয়া বসিল।

খোকার এই অর্বাচীনতায় রমা সচকিতে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল। কেশরের বুকের মধ্যে রোদনের মত একটা বাষ্পোচ্ছ্বাস গুমরিয়া উঠিল; তাহার ইচ্ছা হইল, পরম নিষ্পাপ, নবনীতের মত কোমল এই শিশুটিকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরে। কিন্তু সে খোকাকে দুই হাতে কোল হইতে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া ভারী গলায় বলিল—

কেশর: না বাবা, তুমি আমার কোলে এসো না; তোমার মা হয় তো এখুনি তোমায় নাইয়ে দেবেন—

ইহা তেজের কথা নয়, অভিমানের কথা। মুহূর্তে রমার মন গলিয়া গেল।

রমা: না না, থাক না আপনার কাছে—কী হয়েছে? আমার ওসব—কুসংস্কার নেই।

কেশর তিক্ত হাসিল কিন্তু খোকাকে আবার কোলে বসাইল।

কেশর: ওটা কথার কথা। কিন্তু সে থাক, তোমার ভালমন্দ তোমার কাছে আমার ভাল-মন্দ আমার কাছে—কেউ তো কারুর ভাগ নিতে পারবে না। তবে—আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, দুনিয়াও ঢের বেশী দেখেছি। মানুষ যা বলে তা সত্যি নয়, মানুষ যাকে যে চোখে ছাখে তাও সব সময় সত্যি ছাখা নয়।—

রমা: কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কেশর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, খোকার মাথায় একবার হাত বুলাইল, তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

কেশর: তোমার জীবন আমার অজানা নয়। আমিও একদিন

তোমার মত ঘরের বৌ ছিলুম—স্বামীর ঘর করেছি। কিন্তু ভগবান ঘরের বৌ ক'রে আমাকে সৃষ্টি করেন নি। ভগবান আমাকে অসামান্য রূপ অসামান্য গুণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন, নিজের মুখে বললেও একথা সত্যি। যৌবনের আরম্ভে যখন নিজের কথা নিজে ভাবতে শিখলুম, তখন দেখলুম—এ আমি কোথায় কোন্ অন্ধকার কূয়োর মধ্যে পড়ে আছি! এর চেয়ে ঢের বড় জায়গা, খোলা যায়গা আমায় ডাকছে। এখানে আমার স্থান নয়, আমার স্থান অন্য আসরে।—লোকে আমাকে কুলটা বলতে পারে, ঘৃণাও করতে পারে, কিন্তু কী আসে যায় তাতে? কাঁটা কোথায় নেই? তোমার পথেও কাঁটা আছে, আমার পথেও কাঁটা আছে। আমার সান্ত্বনা এই যে, নিজের স্থান আমি বেচে নিয়েছি, নিজের আসন আমি অধিকার করেছি।

রমা গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল; তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খোকা ইত্যবসরে কেশরের কোলে শুইয়া ঘুমাইবার উপক্রম করিতেছিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। তারপর রমা হাত হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল—

রমা: আপনি সুখী হয়েছেন?

কেশর: সুখী? হয়েছি বৈকি। অন্তত ঘরের কুলবধূ হয়ে থাকলে এরচেয়ে বেশী সুখী হতাম না একথা জোর করে বলতে পারি।

রমা: আমি বিশ্বাস করি না; আপনি সুখী হন নি।—আপনি যার লোভে এ পথে পা দিয়েছিলেন তা পান নি, আপনার জাতও গেছে পেটও ভরে নি।

কেশর ক্ষণেক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল; একটা স্পষ্টবাদিতা সে নরম-স্বভাব রমার কাছে প্রত্যাশা করে নাই। তাহার মন আবার যুদ্ধোদ্যত হইয়া উঠিল।

কেশর : এটা তোমার কুসংস্কার, বুদ্ধি-বিবেচনার কথা নয়।

রমা : (দৃঢ়স্বরে) না, বুদ্ধি-বিবেচনারই কথা। সংসার করতে হ'লে শুধু কুসংস্কারের ওপর ভর দিয়ে বসে থাকলে চলে না, একটু-আধটু ভাবতেও হয়। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অভিজ্ঞতায় ছোট হতে পারি, কিন্তু আমাকেও অনেক কথা ভাবতে হয়েছে। আপনি স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, মান যশ মর্যাদা চেয়েছিলেন, মেনে নিলুম। স্বাধীনতা খুব বড় জিনিষ, মান-মর্যাদাও তুচ্ছ নয়; কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, মানুষের স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা-মমতা তার চেয়ে ঢের বড় জিনিষ। স্বাধীনতা মান-মর্যাদা ও সব তো উপলক্ষ। আপনার রূপ-যৌবন আছে জানি; গুণও নিশ্চয় আছে—শুনেছি আপনি খুব ভাল নাচতে গাইতে পারেন—কিন্তু এ-সব তো চিরদিনের নয়; আজ আছে কাল শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু জীবন সেই সঙ্গে শেষ হবে না। তখন? (একটু চুপ করিয়া) দেখুন, কেবল যৌবনের কথা ভেবে সারা জীবনের ব্যবস্থা করা তো বুদ্ধিবিবেচনার কাজ নয়। এর পর শুধু শুকনো স্বাধীনতায় আপনার মন ভরবে কি? ভরবে না। কারণ আপনিও চান মানুষের স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা-মমতা। আর তা পাননি বলেই আপনার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে!

কেশর : কে বলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে! মিথ্যে কথা। আমি মানিনা।

রমা : (শান্তস্বরে) না মানুন। কিন্তু আপনি মনে জানেন, যা পেয়েছেন তা তুচ্ছ; আর যা হারিয়েছেন তার জন্যে আপনার বুকে অসীম বেদনা লুকিয়ে আছে—আমি দেখতে পাচ্ছি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) খোকা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

কেশর কোলে খোকার পানে চাহিল; সহসা তাহার দেহ-মন যেন

কোন্ দুরন্ত নিপীড়নে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সে বাষ্প-বিকৃতকণ্ঠে বলিল—

কেশর: হ্যাঁ। তুমি নেবে?

রমা: না, থাক আপনারই কোলে। এখন তুল্‌তে গেলে হয় তো জেগে উঠ্‌বে।

কেশর একদৃষ্টে খোকার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল; সে যখন চোখ তুলিল তখন তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কেশর: (রুদ্ধস্বরে) আর কিছু না, যদি এমনি একটি শিশুকে পৃথিবীতে আনবার অধিকার আমার থাকত—!

রমা তাহার পাশে নতজানু হইয়া বসিল, আর্দ্রকণ্ঠে কহিল—

রমা: আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি বড় অভিমানী; লজ্জার মধ্যে অপমানের মধ্যে আপনি একটি নিষ্পাপ শিশুকে টেনে আনতে পারবেন না। (উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস ফেলিয়া) বড় নিষ্ঠুর সংসার! কত লোক কত ভুল করে, সব শুধ্‌রে যায়; কিন্তু মেয়েমানুষের এ ভুলের যে ক্ষমা নেই দিদি।

কেশর: (চোখ মুছিতে মুছিতে) বোলো না—দিদি বলে ডেকো না—ও নামে আমার অধিকার নেই। আমি কেশর বাঈজী—কেন আমাকে পিছু-ডাক ডাকছ।

রমা: পিছু ডাক কি সবাই শুন্‌তে পায়? আপনিও শুন্‌তে পেতেন না যদি না আপনার পিছু টান থাকত। আপনি আগে যা ছিলেন মনের মধ্যে এখনও তাই আছেন।

কেশর: তাই আছি—সত্যি তাই আছি? তবে কেন সকলে আমাকে শাস্তি দেবে? আমি জানতে চাই—সব ভুলের ক্ষমা আছে, এর ক্ষমা নেই কেন?

রমা : তা আমি জানি না। (একটু চুপ করিয়া) আপনি নিজেও তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন নি—অপরাধের গ্লানি তো আপনার মনেও আছে—!

কেশর : (থতমত) গ্লানি ! কিন্তু সে তো আমার মনের গ্লানি নয়। সমাজ গ্লানির বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে—

বাহিরে ট্রেণ আসিবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে রমার স্বামী হন্তদন্ত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। গলায় গলবন্ধ নাই, এবার তাঁহার মুখাবয়ব ভাল করিয়া দেখা গেল। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সের একটি অতি সাধারণ মানুষ।

রমার স্বামী : ট্রেণ এসে পড়েছে, রমা, ট্রেণ এসে পড়েছে। খোকা কৈ ?

বলিতে বলিতে তিনি রমা ও কেশরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্ষণকাল কেশর ও রমার স্বামী পরস্পরের পানে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন ; তারপর রমার স্বামী একপা পিছাইয়া আসিলেন—

রমার স্বামী : মণি—!

বিদ্যুতাহতের মত কেশর দু'হাতে মুখ ঢাকিল। রমা চমকিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

রমা : কি ! কে ইনি ? তুমি এঁকে চেনো ? ইনি কে ?

ক্ষণিকের মূঢ়তা ভাঙিয়া রমার স্বামী ক্ষিপ্রহস্তে ঘুমন্ত ছেলেকে কেশরের কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন ; তারপর রমার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন—

রমার স্বামী : চলে এস রমা—

রমা : (ব্যাকুলস্বরে) কিন্তু—কে ইনি ?

রমার স্বামী : কেউ না—কেউ না—তুমি চলে এস।

রমাকে একরকম টানিতে টানিতেই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে ট্রেণ আসিয়া পড়িয়াছিল। দুইটা কুলী দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া রমাদের বাক্স-বিছানা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কেশর এতক্ষণ মুখ ঢাকিয়া বসিয়া ছিল, এখন মুখ খুলিয়া হঠাৎ হাসিতে আরম্ভ করিল। হিস্টিরিয়ার হাসি, কিছুতেই থামিতে চায় না। অবশেষে হঠাৎ হাসি থামাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, মুখে একটা ব্যঙ্গ-বিকৃত ভঙ্গি। কেশর মশ্‌লার কৌটা উজাড় করিয়া হাতের উপর ঢালিল।

এই অবসরে বিজয় চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, কেশর সমস্ত মশ্‌লা মুখে দিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া কেশরের হাতে চাপড় মারিয়া মশ্‌লা ফেলিয়া দিল।

বিজয় : এ কি! পাগল হয়ে গেলে নাকি?

কেশর : পাগল! না পাগল হইনি ওরা চলে গেছে?

বিজয় : ওরা কারা?

কেশর : না না, কেউ নয়। ওরা তো এই গাড়ীতেই যাবে।

বিজয় : আমরাও তো এই গাড়ীতেই যাব। দেরী কিসের? এখনি গাড়ী ছেড়ে যাবে—

কেশর : যাক ছেড়ে! বিজয়, আমি দেবীপুরে যাবনা।

বিজয় : দেবীপুরে যাবেনা!

কেশর : না—ফিরে যাব।

বাহিরে হুইসল্ দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কেশর উৎকর্ণ হইয়া গাড়ীর আওয়াজ শুনিতে লাগিল। বিজয় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ীর আওয়াজ দূরে মিলাইয়া গেলে বিজয় সুটকেসের কোণের উপর বসিল।

বিজয়: কেলনারে একলা বসে বসে একটু চোখ লেগে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে কি ঘটেছে কিছুই জানি না। ব্যাপারটা খুলে বল দেখি বাঈজী।

কেশর: (সম্মুখে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া) ব্যাপার! কিচ্ছু না। কয়েকজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল।

বিজয়: চেনা লোক?

কেশর: হ্যাঁ—চেনা লোক—স্বামী, সতীন—সতীনের ছেলে—

কেশর একটু একটু হাসিতে আরম্ভ করিল; ক্রমে তাহার হাসি বাড়িতে লাগিল—উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে।

হিস্টিরিয়ার হাসি।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

পরীক্ষা

বিনায়ক বসুর ড্রয়িংরুম।

রাত্রিকালে বিদ্যুৎবাতির আলোয় ঘরটি অতি সুন্দর দেখাইতেছে। ফিকা সবুজ রংয়ের দেয়াল; নূতন আধুনিক গঠনের আসবাব। তিনটি আলোর বাল্‌ব ঘরে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া ঘরটি প্রায় ছায়াহীন করিয়া তুলিয়াছে।

ঘরের দুইপাশে দুইটি দ্বার, একটি ভিতরে এবং অন্যটি বাহিরে যাইবার পথ। ঘরের তৃতীয় দেয়ালের মাঝখানে ইংলণ্ডেশ্বর ষষ্ঠ জর্জের সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো একটি প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছে।

বিনায়ক বসু ডিনার শেষ করিয়া ড্রয়িংরুমে আসিয়া বসিয়াছে এবং একটি কৌচে প্রায় চিৎ হইয়া শুইয়া একখানি ইংরেজী উপন্যাস পড়িতেছে। তাহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও পাঞ্জাবীর উপর একটি সিল্কের ড্রেসিং গাউন।

বিনায়কের বয়স ত্রিশের নিচেই, সে এখনও অবিবাহিত। তাহাকে সুপুরুষ বলা চলে। গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ, মাথায় ছোট করিয়া ছাঁটা কোঁকড়া চুল; মুখের লালিত্যের সঙ্গে এমন একটা পরিমার্জিত হঠকারিতার ভাব মিশ্রিত আছে যে, তাহাকে চালিয়াৎ বলিয়া মনে হয় এবং তাহার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধেও খট্‌কা লাগে। উপরন্তু সে তরুণীদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারে; তরুণীরাও কেন জানি না, তাহার প্রতি একটু বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হন। এই সব কারণে শহরে তাহার কিছু বদনাম রটিয়াছে।

বিনায়ক সরকারী ইঞ্জিনীয়ার; মাস দুই পূর্বে সে পশ্চিমবঙ্গের এই সমৃদ্ধ শহরে বদলি হইয়া আসিয়াছে এবং স্থানীয় অভিজাত সমাজের তরুণীমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

নিবিষ্ট মনে বই পড়িতে পড়িতে বিনায়ক অন্যমনস্কভাবে চোখ তুলিতেছিল এবং ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া শূন্যে তাকাইতেছিল, যেন তাহার মনের মধ্যে অন্য কোনও চিন্তা ঘোরাঘুরি করিতেছে। একবার সে বই রাখিয়া উঠিল; ঘরের কোণে একটি ক্ষুদ্র আলমারি ছিল, তাহার ভিতর হইতে বোতল ও পেগ বাহির করিয়া পেগ পূর্ণ করিয়া লইয়া আবার আসিয়া বসিল। বই পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে পেগে চুমুক দিতে লাগিল।

বাহিরের দিকের দরজা দিয়া একটি উর্দিপরা ফিটফাট খানসামা প্রবেশ করিল; তাহার হাতে জার্মান সিল্‌ভারের রেকাবের উপর একখানি

চিঠি। খানসামা নিঃশব্দে প্রভুর সম্মুখে রেকাব ধরিল। বিনায়ক চিঠি তুলিয়া লইয়া খাম ছিঁড়িয়া পড়িল। তাহার ভ্রূ একটু উঠিল। সে ঘড়ির দিকে তাকাইল; পাশের টেবিলে বুদ্বুদের ন্যায় কাঁচে ঢাকা সুন্দর একটি টাইমপীস্, তাহাতে দশটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিট হইয়াছে। বিনায়ক চিঠিখানি ড্রেসিং গাউনের পকেটে রাখিল, পেগ তুলিয়া লইয়া খানসামার দিকে না তাকাইয়াই বলিল,—'তুমি এখন যেতে পার, তোমাকে আর দরকার হবে না।—হ্যাঁ, সদর দরজা বন্ধ করবার দরকার নেই।'

খানসামা 'জী' বলিয়া প্রস্থান করিল।

বিনায়ক পেগে একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া রাখিয়া দিল; একটি জয়পুরী কৌটার মধ্য হইতে সিগারেট লইয়া ধরাইয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে পড়িল—

"বিনায়কবাবু, আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে—আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমি আসব—সে সময় যেন কেউ না থাকে—

ইতি—মণিকা নন্দী।"

বিনায়কের মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব কিছুই বোঝা গেল না। সে চিঠি মুড়িয়া পকেটে রাখিল, তারপর সিগারেটে একটা টান দিয়া সেটা অ্যাশ্‌ট্রেতে ফেলিয়া পেগ তুলিয়া লইল।

পেগ ঠোঁটের কাছে তুলিয়াছে এমন সময় বহির্দ্বারের ওপার হইতে স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ আসিল,—'বিনায়কবাবু, আসতে পারি?'

বিনায়ক ক্ষণেক দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর পেগ নামাইয়া রাখিয়া হাস্যমুখে অগ্রসর হইয়া গেল।

বিনায়ক: এস মণিকা।

মণিকা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার আবির্ভাবে ঘরটা যেন ঝলমল করিয়া উঠিল। মণিকা শুধু সুন্দরী নয়, তাহার মুখে চোখে বুদ্ধি ও চিত্তবলের এমন একটি প্রভা আছে যে তাহা তাহার দৈহিক সৌন্দর্যকে আরও ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। মণিকার বয়স কুড়ি বছর, তাহার কবরীতে যূথীফুলের মালা, পরিধানে চাঁপা রঙের একটি সূক্ষ্ম বেনারসী শাড়ি, কর্ণে কণ্ঠে মণিবন্ধে মুক্তার লঘু অলঙ্কার। উচ্ছল যৌবনের ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া সে যখন বিনায়কের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন মনে হইল, সেকালে রাজকন্যারা বুঝি এমনি ভাবেই চোখ ধাঁধাইয়া স্বয়ংবর-সভায় আবির্ভূতা হইতেন।

মণিকার অধরে একটু হাসি লাগিয়া আছে; বিরাগ ও অনুরাগ অবিশ্লেষ্য-ভাবে মিশিয়া গেলে বোধ করি মেয়েদের মুখে এইরূপ হাসি দেখা দেয়। মণিকা বলিল, 'আমার চিঠি পেয়েছিলেন?'

বিনায়ক পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া ধরিল, মণিকাকে দেখিয়া তাহার বুক যে গুরুগুরু করিতেছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না।

বিনায়ক: সেকালের পণ্ডিতগুলো ঠিক ধরেছিল। স্ত্রীজাতির চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য—কখন কি ঘটবে বলা যায় না। আমার ভাগ্য যে হঠাৎ এত প্রসন্ন হয়ে উঠেছে তা দশটা বেজে পঁচিশ মিনিটের আগে জানতে পারিনি। তাই সামাজিক ভদ্রবেশ পরবার সময় পেলুম না।

মণিকা এই ক্রটি-স্বীকারের কোনও উত্তর না দিয়া চিঠিখানি লইয়া নিজের ব্লাউজের মধ্যে রাখিল।

মণিকা: এটার আর বোধ হয় আপনার দরকার নেই?

বিনায়ক মুখ টিপিয়া হাসিল।

বিনায়ক: না। তা ছাড়া তোমার চিঠি আমার কাছে না থাকাই

ভাল! সাবধানের মার নেই। কিন্তু যাক্, তোমার সম্বর্ধনা করা হয়নি। এস—বোসো—

মণিকাকে সোফায় বসাইয়া সিগারেটের জয়পুরী বাক্সটা তাহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়া বিনায়ক বলিল, 'নাও।'

মণিকা একবার বাক্সের দিকে তাকাইল, একবার বিনায়কের মুখের পানে তাকাইল, তারপর শান্তকণ্ঠে বলিল,—'আমি সিগারেট খাই না। আপনার পরিচিতা মহিলারা সকলেই বুঝি সিগারেট খান ?'

বিনায়ক: সকলেই নয়। তবে কয়েকজন আছেন যাঁরা এক টানে একটা আস্ত সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারেন। কিন্তু তুমি যখন ধূমপান কর না তখন অন্য কোনও পানীয়ের ব্যবস্থা করি! চা—? কফি—? সরবৎ—?

মণিকা পেগের দিকে কটাক্ষপাত করিল।

মণিকা: আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না, বরং আপনি যা খাচ্ছিলেন সেটা শেষ করে ফেলুন।

বিনায়ক: আমি—? ওঃ!

অর্ধপূর্ণ পেগ হাতে তুলিয়া লইয়া বিনায়ক হাসিল।

বিনায়ক: তুমি যা ভাবছ তা নয়, আমি মাতাল নই। মাঝে মাঝে ডিনারের পর একটু পোর্ট খাই, শরীর ভাল থাকে। তুমিও ইচ্ছে করলে খেতে পার। মেয়েদের পোর্ট খেতে বাধা নেই।

মণিকা: ধন্যবাদ। পোর্ট আর ব্রাণ্ডি-হুইস্কির মধ্যে কি তফাৎ তা বোঝবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। সুতরাং ওটা থাক্।

বিনায়ক পেগ নিঃশেষ করিয়া রাখিয়া দিল।

বিনায়ক: বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছে। আমার অতিথি-সৎকারের ত্রুটি হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু উপায় কি ?

সে কৌচের অন্য প্রান্তে বসিল। মণিকা ঘরের চারিদিকে একবার সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাইল; রাজার ছবির উপর দৃষ্টি পড়ায় তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল।

মণিকা : আপনি খুব সৌখীন লোক দেখছি। কিন্তু রাজার ছবি কেন? ওতে আপনার ড্রয়িংরুমের শোভা আরও বেড়েছে বলে মনে হয়?

বিনায়ক : না ওটা ভেক।

মণিকা : ভেক?

বিনায়ক : হ্যাঁ। ইংরেজের চাকরি করতে হলে ওটা দরকার হয়।

মণিকা : (ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে) আমার বাবাও ইংরেজের চাকরি করেন, এ জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তিনি। কিন্তু তিনি তো ঘরে রাজার ছবি টাঙান্নি!

বিনায়ক : তবে কার ছবি টাঙিয়েছেন?

মণিকা : কারুর নয়। বাবার ঘরে কোনও ছবিই নেই।

বিনায়ক : আমার ঘরে কিন্তু অন্য ছবি আছে।

মণিকা : (চারিদিকে চাহিয়া) কৈ—কোথায়? দেখছি না তো!

বিনায়ক : এস আমার সঙ্গে—দেখাচ্ছি।

সে উঠিয়া রাজার ছবির দিকে গেল, মণিকাও তাহার অনুবর্তিনী হইল। বিনায়ক ছবির ফ্রেমের উপর একটা বোতাম টিপিতেই রাজার ছবি উল্টাইয়া গিয়া তাহার স্থানে মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেখা দিল। মণিকা কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিল, তারপর একটু অপ্রতিভভাবে হাসিল।

মণিকা : ভুলে গেছলুম আপনি ইঞ্জিনীয়র। বেশ কল বানিয়েছেন—

সে ফিরিয়া গিয়া কৌচে বসিল।

মণিকা ঃ কিন্তু এতে একটা কথা প্রমাণ হল।

বিনায়ক ঃ কী প্রমাণ হল ?

মণিকা ঃ প্রমাণ হল যে আপনার ভেতরে এক বাইরে আর। আপনি সাদা লোক নন।

বিনায়ক ঃ (হাসিয়া) এতে আশ্চর্য হবার কী আছে। পৃথিবীতে সাদা লোক ক'টা পাওয়া যায় ? তুমি আজ যে ভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ তার মধ্যেও তো লুকোচুরি রয়েছে।

মণিকার মুখ একটু লাল হইল, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিনায়কের মুখের পানে চাহিল।

মণিকা ঃ লুকোচুরি কিছু নেই। আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

বিনায়ক ঃ বেশ, তো। কিন্তু সেজন্য এই রাত্রে একলা আসার দরকার ছিল কি ? অন্তত তোমার ছোট ভাই শম্ভু সঙ্গে এলে কোন দোষ হত না।

মণিকা যেন একটু অস্বস্তি অনুভব করিল, একবার চকিত চক্ষে বাহিরের দ্বারের পানে তাকাইল, তারপর একটু তাড়াতাড়ি বলিল,—'একলা আসার দরকার ছিল। আমার কথা গোপনীয়। এ বাড়িতে আর কেউ নেই তো ?'

বিনায়ক ঃ কেউ না। স্রেফ তুমি আর আমি।

বিনায়ক আড়চোখে মণিকার পানে তাকাইল। মণিকার মুখে ক্ষণেকের জন্য শঙ্কার ছায়া পড়িল ; তারপরই সে সোজা হইয়া বসিল, তাহার চক্ষু প্রচ্ছন্ন উত্তেজনায় প্রখর হইয়া উঠিল। বিনায়ক তাহা লক্ষ্য না করিয়া বাক্স হইতে সিগারেট লইতে লইতে প্রশ্ন করিল,—'আপত্তি নেই ? খেতে পারি ?'

মণিকা : স্বচ্ছন্দে।

সিগারেট ধরাইয়া বিনায়ক কৌচের পাশে বসিল, কয়েকটা ধোঁয়ার আংটি ছাড়িয়া বলিল,—'এবার তোমার গোপনীয় প্রশ্ন আরম্ভ হোক।'

মণিকা বিনায়কের পানে তাকাইল না, দেয়ালে মহাত্মার ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—'আজ সকালে আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?'

বিনায়ক : হাঁ।

মণিকা : আমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন?

বিনায়ক : করেছিলুম।

চকিতে বিনায়কের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি ফিরাইয়া মণিকা বলিল,—'বিয়ের প্রস্তাব করবার কী যোগ্যতা আছে আপনার?'

সিগারেটের ছাই সন্তর্পণে অ্যাশ্-ট্রেতে ঝাড়িয়া বিনায়ক নীরসকণ্ঠে বলিল,—'যোগ্যতার পরিচয় তো আজ সকালে তোমার বাবার কাছে দিয়েছি। আমি সরকারী ইঞ্জিনীয়র, বর্তমানে চার শ' টাকা মাইনে পাই; ভবিষ্যতে মাইনে আরও বাড়বে। আমার স্বাস্থ্যও বেশ ভাল—'

মণিকা : (অধীরভাবে) আমি ও যোগ্যতার কথা বলছি না। বিয়ে করবার নৈতিক যোগ্যতা আপনার আছে কি?

বিনায়ক : কথাটা একটু পরিষ্কার করে না বললে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।

মণিকা : বিনায়কবাবু, যে কুমারী আপনাকে বিয়ে করবে, সে আপনার কাছে নৈতিক পবিত্রতা আশা করতে পারে, একথা আপনি স্বীকার করেন?

বিনায়ক : নিশ্চয় স্বীকার্ করি। শুধু তাই নয়, আমি বিশ্বাস করি, যে-পুরুষের নৈতিক পবিত্রতা নেই তার বিয়ে করা উচিত নয়।

মণিকা কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে বিনায়কের পানে চাহিয়া রহিল।

মণিকা : তাহলে আপনি বিয়ে করতে চান কোন্ সাহসে ?

বিনায়ক : (গম্ভীরস্বরে) আমার সে দাবী আছে।

মণিকা অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া উঠিল।

মণিকা : বিনায়কবাবু, আপনি নিজেকে যতটা সাধু বলে প্রমাণ করতে চান, সত্যি আপনি ততটা সাধু নন। আজ আমি নিজের চোখে আপনাকে মদ খেতে দেখেছি। তা ছাড়া শহরে আপনার অন্য বদনামও আছে—

বিনায়ক। অসম্ভব নয়, বদনাম কার না হয় ? কিন্তু মদের কথা যে বললে, আগেই বলেছি আমি মাতাল নই, নিয়মিত মদ খাই না—

মণিকা : প্রমাণ করতে পারেন ?

বিনায়ক : (হাসিয়া) একথা প্রমাণ করা যায় না। মহাত্মা গান্ধীও প্রমাণ করতে পারেন না, যে তিনি লুকিয়ে মদ খান না ; ওটা তাঁর চরিত্র থেকে অনুমান করে নিতে হয়। তোমার কথাই ধরো। আজ তুমি একলা লুকিয়ে আমার বাড়িতে এসেছ। লোকে যদি মনে করে তুমি রোজ রাত্রে আমার বাড়িতে আসো, সেকথা কি সত্যি হবে ?

মণিকা : আচ্ছা ও কথা ছেড়ে দিলুম। কিন্তু আপনি যে স্ত্রীজাতির সঙ্গ খুবই ভালবাসেন একথা অস্বীকার করতে পারেন ?

বিনায়ক হাসিয়া উঠিল, দগ্ধাবশেষ সিগারেট অ্যাশ্-ট্রের উপর ঘষিয়া নিভাইয়া বলিল—কি মুস্কিল, অস্বীকার করতে যাব কোন্ দুঃখে ? স্ত্রীজাতির সঙ্গ যদি ভালই না বাসব, তাহলে তোমাকে বিয়ে করতে চাই কেন ?'

মণিকার দৃষ্টি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

মণিকা : হেসে ওড়াবার চেষ্টা করবেন না। দু'মাস হল আপনি

এ শহরে এসেছেন, এরি মধ্যে আপনার সব কীর্তি প্রকাশ হয়ে পড়েছে।—অমিতা সেনের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক তা সবাই জানে।

বিনায়কের মুখ সহসা কঠিন হইয়া উঠিল।

বিনায়ক: না, কেউ জানে না। অমিতার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক—তা শুধু আমি জানি আর অমিতা জানে!

মণিকা: সত্যি? খুব গোপনীয় সম্পর্ক বুঝি? আমরা জানতে পারি না?

বিনায়ক: অমিতা আমার ভাবী ভাদ্রবধূ। তোমরা জান না, আমার ছোট ভাই বিলেত গেছে। অমিতা তাকে ভালবাসে।

মণিকা থতমত খাইয়া গেল।

মণিকা: ও, তা তাই যদি হয়, তাহলে এত লুকোচুরির কি দরকার?

বিনায়ক: লুকোচুরির কারণ অমিতার বাবা এ বিয়ের বিরুদ্ধে, তিনি জাতের বাইরে মেয়ের বিয়ে দিতে চান না।

মণিকার দৃষ্টি নত হইল, কিন্তু তখনি আবার সে চোখ তুলিল।

মণিকা: আচ্ছা, সে যেন হল। মেয়ে-স্কুলের টিচার মিসেস রমা গাঙ্গুলীর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধটা কি রকম?

বিনায়ক: তিনি আমরে বান্ধবী।

মণিকা: (মুখ টিপিয়া) বান্ধবী। ও কথাটার অনেক রকম মানে হয়।

বিনায়ক ক্ষণেক গম্ভীর হইয়া রহিল, তারপর ঈষৎ ভৎ‍‌র্সনার স্বরে বলিল—মণিকা, আমার সম্বন্ধে তুমি যা ইচ্ছে ভাবতে পার, কিন্তু একটি শুদ্ধচরিত্রা নিষ্ঠাবতী বিধবা মহিলা সম্বন্ধে ও রকম ইঙ্গিত করলে অপরাধ হয়।'

মণিকার মুখে লজ্জার রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার

মেরুদণ্ডও শক্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া সে ঈষৎ তিক্তস্বরে বলিল, 'আর হাসপাতালের লেডি ডাক্তার মিস্ মল্লিকা? তিনিও কি শুদ্ধচরিত্রা নিষ্ঠাবতী মহিলা? তাঁর সঙ্গেও তো আপনার খুব ঘনিষ্ঠতা।'

বিনায়কের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি খেলিয়া গেল।

বিনায়ক: শ্রীমতী মল্লিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটু অন্য ধরণের। শিকারের সঙ্গে শিকারীর যে ঘনিষ্ঠতা, তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও সেই রকম। ভুল বুঝো না; তিনি শিকারী—আর আমি শিকার। ভাগ্যক্রমে এখনও অক্ষত শরীরে আছি।

মণিকা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; বিনায়কও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। মণিকা অস্থিরভাবে ঘরের এটা-ওটা নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন কিছুতেই তাহার মনের অসন্তোষ দূর হইতেছে না।

বিনায়ক: কি হল! আর কোনও প্রশ্ন খুঁজে পাচ্ছ না?

মণিকা: ক'টা বেজেছে? আমি এবার বাড়ি যাব।

ঘড়ি দেখিবার জন্য বিনায়ক পিছন ফিরিতেই মণিকা এক অদ্ভুত কাজ করিল, মদের শূন্য পেগটা তাহার হাতের কাছেই ছিল, ক্ষিপ্র হস্ত-সঞ্চালনে তাহা মেঝেয় ফেলিয়া দিল। ঝন্ঝন্ করিয়া কাঁচভাঙার শব্দ হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবাতি নিভিয়া ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকারের ভিতর হইতে মণিকার উচ্চকিত কণ্ঠস্বর আসিল,—'ঐ বাঃ! এ কী হল! আলো নিভে গেল! বিনায়কবাবু?'

বিনায়ক: কোনও ভয় নেই। মাঝে মাঝে এমন হয়—পাওয়ার হাউসে কোন গোলমাল হয়ে থাকবে। তুমি যেমন আছ তেমনি দাঁড়িয়ে থাকো, নইলে পায়ে কাঁচ ফুটে যেতে পারে। আমি পাশের ঘর থেকে মোমবাতি নিয়ে আসছি।

মণিকা: না না, আপনি কোথাও যাবেন না, আমার ভয় করবে।

বিনায়কের হাসির শব্দ শোনা গেল।

বিনায়ক : আচ্ছা আমি দেশলাই জ্বালছি।

সে ফস করিয়া দেশলাই জ্বালিল। অন্ধকার কিন্তু সম্পূর্ণ দূর হইল না, দু'জনকে আবছায়াভাবে দেখা গেল। মণিকা সেই অস্পষ্ট আলোকে সাবধানে পা ফেলিয়া আবার কৌচে আসিয়া বসিল। দেশলাই-কাঠি নিভিয়া গেল।

মণিকা : আপনার কাঁচের গ্লাসটা ভেঙে ফেললুম—

বিনায়ক : কি করে ভাঙল ?

মণিকা : কি জানি অসাবধানে হাত লেগে গিছল।

বিনায়ক আবার দেশলাই জ্বালিল। দেখা গেল, তাহার মুখে একটু বাঁকা হাসি লাগিয়া আছে।

বিনায়ক : মদের গ্লাস ভাঙার মধ্যে হয়তো নিয়তির কোনও ইঙ্গিত আছে।

মণিকা : তা জানি না। আপনি অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? কাছে আসুন, আমার যে ভয় করছে।

বিনায়ক মণিকার কাছে গিয়া বসিল। দেশলাই নিঃশেষ হইয়া নিভিয়া গেল।

মণিকা : আমার হাত ধরুন।

বিনায়ক : হাত ধরলে দেশলাই জ্বালব কি করে ?

মণিকা : দেশলাই জালতে হবে না।

কিছুক্ষণ নীরব। বিনায়ক মণিকার হাত ধরিয়া আছে কিনা অন্ধকারে তাহা দেখা গেল না।

বিনায়ক : মণিকা !

মণিকা : কী ?

বিনায়ক : ঘর অন্ধকার—

মণিকা : জানি।

বিনায়ক : তুমি আর আমি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই।

মণিকা : হুঁ।

বিনায়ক : আমার মত অসাধু লোকের সঙ্গে থাকতে তোমার ভয় করছে না ?

মণিকা : না।

বিনায়ক : তোমরা অদ্ভুত জাত। সাধে পণ্ডিতেরা বলেছেন—

মণিকা : পণ্ডিতদের কথা শুনতে চাই না।

বিনায়ক : বেশ, চল তাহলে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

মণিকা : না। আলো জ্বললে বাড়ি যাব।

বিনায়ক : আলো কখন জ্বলবে ঠিক নেই। আজ রাত্রে না জ্বলতেও পারে।

মণিকা কথা বলিল না। ক্ষণেক পরে বিদ্যুৎবাতি যেমন হঠাৎ নিভিয়া গিয়াছিল তেমনি হঠাৎ জলিয়া উঠিল। দেখা গেল, দুইজনে পাশাপাশি কৌচের উপর বসিয়া আছে, মণিকার ডান হাত বিনায়কের বাম মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ।

মণিকা বিনায়কের মুখের পানে চাহিয়া মধুর আনন্দোচ্ছল হাসিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া নম্র কুহক-কোমল স্বরে বলিল,—'এবার আমি বাড়ি যাই ?'

বিনায়কও উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিনায়ক : তুমি আজ আমাকে অনেক জেরা করেছ। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে ?

মণিকা : কি প্রশ্ন ?

বিনায়ক : আমি ভাগ্যবান কিম্বা হতভাগ্য সেটা জানাবে কি ?

মণিকা বিনায়কের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

মণিকা : তুমি ভাগ্যবান কিনা জানি না, কিন্তু আমার ভাগ্য মন্দ নয়।

বিনায়কের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে মণিকার সম্মুখে গিয়া তাহার একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

বিনায়ক : আর তোমার মনে সন্দেহ নেই ?

মণিকা : না।

বিনায়ক : (হাসিয়া) অন্ধকারের পরীক্ষায় পাশ করেছি তাহলে ?

মণিকা : হাঁ। (চমকিয়া) অ্যাঁ, কি বললে ? অন্ধকারের পরীক্ষা ! তুমি—তুমি বুঝতে পেরেছ ?

বিনায়ক : তা পেরেছি—

মণিকা : কী করে বুঝলে ?

বিনায়ক : খুব সহজে। তুমি যখন হাত দিয়ে গ্লাসটা ফেলে দিলে তখন আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলুম, ঘড়ির কাঁচে সবই দেখতে পেলুম। তারপরই আলো নিভে গেল। বুঝতে দেরি হল না যে, গেলাস ভাঙার শব্দটা সঙ্কেত, তোমার যে সহচরটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি বারান্দায় মেন্ সুইচ বন্ধ করে দিলেন। সহচরটি বোধ হয় শম্ভু—না ?

মণিকা নীরব বিস্ময়ে ঘাড় নাড়িল।

বিনায়ক : এর পরে তোমার এই রাত্তিরে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার প্ল্যানটা পরিষ্কার হয়ে গেল : অন্ধকারে আমি কোনও অসভ্যতা করি কিনা তাই পরীক্ষা করতে চাও। যখন বুঝতে পারলুম তখন পরীক্ষায় পাশ করা আর শক্ত হল না।

মণিকার মুখ আবার সংশয়াকুল হইয়া উঠিল।

মণিকা: কিন্তু—কিন্তু—আমার সন্দেহ তো তাহলে গেল না! তুমি যদি জেনে-শুনে—

বিনায়ক হাসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল।

বিনায়ক: একটু সন্দেহ থাকা ভাল। কবি বলেছেন—'ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম একান্ত বিশ্বাসে হয়ে আসে জড় মৃতবৎ, তাই তারে মাঝে মাঝে জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে।'* কিন্তু মণিকা, আমি যদি সত্যিই অসভ্যতা করতুম? শম্ভু এসে অবশ্য আমাকে উত্তম-মধ্যম দিত। কিন্তু তুমি কী করতে?

মণিকার মুখ কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিল।

মণিকা: কী আর করতুম, তোমাকেই বিয়ে করতুম। তুমি কি আমার কিছু রেখেছ? আমার নিজের ইচ্ছে বলে কি কিছু আছে?

দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া মণিকা কাঁদিবার উপক্রম করিল। স্নেহে আনন্দে বিনায়কের মুখ কোমল হইয়া উঠিল। সে মণিকার চুলের উপর একবার লঘুস্পর্শে হাত বুলাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—'ওহে শম্ভু, ভেতরে এস।'

আঠারো বছরের হৃষ্টপুষ্ট বলবান যুবক শম্ভু একটি হকি-ষ্টিক্ হাতে লইয়া প্রবেশ করিল এবং প্রসন্নমুখে দন্ত বিকশিত করিল।

বিনায়ক: শম্ভু, তোমার বোনকে শ[illegible]ড়ি [illegible]যাও। আর বেশি দেরি করলে আমার বদনাম রটে যাবে।

* রাজা ও রাণী

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড [illegible]-এর পক্ষে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও [illegible]
কলিকাতা হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।